The Abysmal Brute
and
The Seed of Maccoy
by
Jack London

প্রকাশক
রেণুকা সাহা
১০ কেশবসেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৯
প্রচ্ছদপট
সন্দীপন ভট্টাচার্য
মুদ্রাকর
দি অন্নদা প্রেস
১৯ই, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

ঝিলাম
অভিমন্যু
আর
ঋত্বিক-কে

অন্যান্য প্রকাশনা

হাওয়ার্ড ফাস্ট

কনসিভড্ ইন লিবার্টি

টল হানটার

টনি এ্যান্ড দি ওয়াণ্ডারফুল ডোর

কৃষণ চন্দর

দাদর পুলের বাচ্চারা

তোমার মুখ

গাধার জবানবন্দি

লালতাজ

পিকনিক

জঙ্গলকা রাজা

মার্কটোয়েন

টমসয়্যার এ্যাব্রড

জিওফ্রে ট্রিজ

বোজ এগেনসট্ দি ব্যারণস

আনা ফ্রাঙ্ক

গল্প উপন্যাস স্মৃতিকথা

এরস্কিন কল্ডওয়েল

ট্রাবল ইন জুলাই

স্টিভ্ নেলসন

ভলান্টিয়ার্স

ম্যাক্সিম গর্কি

মা

উইল জেমস

স্মোকি

জ্যাক লণ্ডন

বিশ্বসাহিত্যে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের নাম নিঃসন্দেহে জ্যাক লণ্ডন। তিনি নিজেও ছিলেন বিশ্বের দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের একজন। ভয় কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য শব্দগুলিকে তিনি তাঁর জীবন অভিধান থেকে নির্মমভাবে বর্জন করেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায় ···to live placidly and complacently is not to live at all। এই একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই তাঁর লেখা 'বার্ণিং ডেলাইট' উপন্যাসের নায়কের মুখে,—আমার মধ্যে রয়েছে যৌবনের বেহিসেবী উদ্দামতা, ডলারের চাইতে রোমান্সের প্রতি অনুরাগ। স্বচ্ছন্দ আরামে রাত কাটানোর চাইতে দুঃসাহসিক বিপদসংকুল অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়তেই ভালো লাগে আমার।

তাঁর চল্লিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন কেটেছে রূঢ় জীবনের লবনাক্ত স্বাদ গ্রহণে আর সীমাহীন দুঃখ দুর্দশার মধ্যে মানুষের অপরাজেয় সত্তার সন্ধানে। জনৈক সমালোচক যথার্থই লিখেছেন,—"জ্যাক লণ্ডন যা কিছু লিখে গিয়েছেন তার মধ্যে সর্বোত্তম কাহিনীটি হচ্ছে তাঁর নিজেরই জীবন। তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছেঃ কৈশোরেই খবরের কাগজ ফেরি, কুলিগিরি, টিনফুডের কারখানায় দিনমজুরী, উপকূলভাগের ঝিনুক লুটেরা দস্যুদের দলে যোগদান ; পরবর্তীকালে জল পুলিসের চাকরি, তারপর দীর্ঘকাল, ব্যাপি ভবঘুরের জীবন যাপন। আরো পরে রুশজাপান যুদ্ধের রিপোর্টার, বক্সিংএর রেফারীর কাজ। সিল শিকারী হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে পাড়ি দিয়েছেন একাধিকবার। নর-খাদকদের দেশে গিয়েছেন শ্রমিক সংগ্রহ করতে। কঠিন শীতের বরফ ঢাকা প্রান্তরে কণ্টকর দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে সোনার সন্ধানে ফিরেছিলেন উত্তরমেরুর ক্লনডাইকে। বৈচিত্রময় জীবনের এইসব অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে।

১৮৭৬ সালের ১২ই জানুয়ারী আমেরিকা যুক্তরাষ্টের সানফ্রান্সিসকো নগরে জ্যাক লণ্ডন জন্মগ্রহণ করেন। জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিকূলতা ছিল জ্যাকের সঙ্গী, নইলে তাঁর নাম তো জ্যাক চ্যানে হিসেবেই খ্যাতি লাভ করার কথা। সঙ্গীত শিক্ষিকা মা ফ্লোরা ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অধ্যাপক উইলু,

এইচ, চ্যানের সন্তান ছিলেন তিনি। যদিও জ্যাকের জন্মের সময় ফ্লোরা এবং অধ্যাপক চ্যানের মধ্যে বৈধ বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল না। জ্যাকের জন্মের কিছু কাল পরে ফ্লোরা বিপত্নীক জন লন্ডনকে বিয়ে করেন। ছ' বছর বয়সে জ্যাক জানতে পারেন জন লন্ডন তাঁর নিজের পিতা নন। সৎপিতা জন লন্ডন ছিলেন একজন ব্যক্তিত্বহীন সাধারণ মানের মানুষ। জ্যাকের জীবনে তাঁর কোনো প্রভাবই পড়েনি। বরং অধ্যাপক চ্যানের অনেক চারিত্রিক গুণ লক্ষ্য করা গিয়েছে জ্যাকের মধ্যে। একুশ বছর বয়সে জ্যাক জানতে পারেন অধ্যাপক চ্যানে-ই তাঁর পিতা। এবং অধ্যাপক চ্যানেকে চিঠি লিখে জানতে চান তিনি তাঁকে নিজের সন্তান বলে স্বীকার করবেন কি না। উত্তরে অধ্যাপক চ্যানে অবশ্য স্বীকার করেছিলেন যে ১৮৭৪-এর জুনমাস থেকে ১৮৭৫-এর জুনমাস পর্যন্ত ফ্লোরা ও তিনি একত্রে বসবাস করেছেন, কিন্তু নিজেকে জ্যাকের পিতা পরিচয় দিতে অস্বীকৃত হন তিনি। কেন অধ্যাপক চ্যানে জ্যাকের পিতৃত্ব স্বীকার করেননি তা অনুমানের বিষয়, আগ্রহী পাঠক আর্ভিং স্টোনের 'সেলর অন হর্সব্যাক' গ্রন্থটি পড়ে দেখতে পারেন। যাইহোক নিজের রহস্যাবৃত জন্মের কারণে জ্যাক লন্ডন আজীবন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে গিয়েছেন।

সঙ্গীতজ্ঞ মায়ের খামখেয়ালী প্রকৃতি ও জন লন্ডনের ব্যক্তিত্বহীন অলস চরিত্রের কারণে সংসারে স্বচ্ছলতা ছিল না, নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে কেটেছে জ্যাক লন্ডনের বাল্য ও কৈশোর জীবন। বাল্যজীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রায়ই বলতেন '... a boy without a boyhood।' গ্রামার স্কুলে পড়ার সময়ে সকালে ও সন্ধ্যায় খবরের কাগজ বিক্রি করতেন তিনি। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ওই গ্রামার স্কুল পর্যন্তই। তেরো বছর বয়সে স্কুল থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে আনা হয় যদিও মা তাকে পড়াশোনা করতে সব সময় উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন। সংসারে আর্থিক সাহায্য করতে এই সময়ে তিনি হোটেলের মেঝে পরিষ্কার করার চাকরি নিয়েছেন। কাজ করেছেন লন্ড্রীতে। কিন্তু এসব কাজে তাঁর এতটুকু মন বসত না। স্কুলে পড়ার সময়েই তাঁর জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যা তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে দিয়েছিল। একদিন স্কুল ফেরৎ ঘুরতে ঘুরতে বালক জ্যাক একটি পাবলিক লাইব্রেরীতে ঢুকে পড়ে। আর লাইব্রেরীতে ঢুকেই অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে সে। বিশাল অট্টালিকাময় থরে থরে সাজানো অসংখ্য বই। পৃথিবীতে যে এত বই আছে সে সম্বন্ধে জ্যাকের আগে কোনো ধারণাই ছিল না। আবেশভরে বই-এর গায়ে হাত বুলোতে থাকে সে। ঐখানে মিস ইনা কুলবার্থ নামে এক বিদুষী তরুণী জ্যাকের এই গ্রন্থপ্রীতি

লক্ষ করে এগিয়ে এসে কয়েকটি বই পড়তে দেন জ্যাককে। কিছুদিনের মধ্যেই মিস কুলবার্থ বুঝতে পারেন যে, এই বালক পড়তে চায় শুধু দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী,—সমুদ্র, পাহাড়, বনজঙ্গল, মেরু ও মরু বিজয়ের কাহিনী। বলা যেতে পারে জ্যাকলণ্ডনের স্পিরিচুয়্যাল বার্থ হয়েছে ওই সময় থেকেই। ওই বয়সেই, জ্যাকের পড়া হয়ে গিয়েছিল স্মলেটের 'অ্যাডভেঞ্চার অফ পেরিগ্রিন পিক্‌ল' এবং উইলকি কলিন্‌স-এর 'দ্য নিউ ম্যাগডালেন'। জ্যাক লণ্ডনের সাহিত্যিক জীবনে যদি কোনো একক ব্যক্তির প্রভাব থেকে থাকে তো তাঁর নাম মিস ইনা কুলবার্থ। আজীবন তিনি জ্যাককে যথার্থ বই-এর সন্ধান এবং সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

জ্যাক লণ্ডনের জীবনে প্রধান আকর্ষন ছিল দুটি : এক—বই, দুই—সমুদ্র। প্রতিটি অভিযানেই জ্যাক লণ্ডনের সঙ্গে থাকত বিশেষ একটি বই। ক্লনডাইক অভিযানে তাঁর সঙ্গে ছিল ডারউইনের 'দ্য অরিজিন অফ স্পেসিস'। স্বল্প আলোকে ঐ অভিযানেই বইখানি তিনি পড়ে ফেলেছিলেন। জ্যাক লণ্ডনের প্রিয় লেখক ছিলেন ডারউইন, স্পেন্সার, মার্কস ও নিৎসে। এই মহাজ্ঞানীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন বলেই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে দার্শনিক গভীরতার সন্ধান পাওয়া যায়। জনৈক সমালোচকের ভাষায় ডারউইন, স্পেন্সার, মার্কস ও নিৎসে ছিলেন জ্যাক লণ্ডনের 'ইনটেলেকচুয়্যাল গ্র্যাণ্ড পেরেন্টস'।

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ তাঁকে প্রতিনিয়তই হাতছানি দিয়ে ডাকত। সেই অমোঘ আহ্বানে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেননি। তের বছর বয়সেই কিছু টাকা জমিয়ে একটি পুরনো নৌকা কিনে সমুদ্র যাত্রার প্রাথমিক শিক্ষার স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। সতের বছর বয়সে শীল মাছ শিকারের জাহাজে চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন জাপানে। সেই সময় একাদিক্রমে সাত মাস ছিলেন সমুদ্রে। এখানেই শিকার ও শিকারীর আদিম সংগ্রামের অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর। সেই অভিজ্ঞতাই প্রতিফলিত হয়েছিল জাপানের সমুদ্র সৈকতে টাইফুনের নিখুঁত বর্ণনাত্মক প্রবন্ধে। 'সানফ্রান্সিস্‌কোয় 'মর্নিং কল' পত্রিকা আয়োজিত এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় জ্যাক লণ্ডনের প্রবন্ধটি প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কার পায়। এতে উৎসাহিত হয়ে জ্যাক লণ্ডন লেখা-কেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করবেন বলে মনস্থির করেন। বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠাতে লাগলেন আপন অভিজ্ঞতায় ভরপুর লেখা কিন্তু একে একে সব লেখাই সম্পাদকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসতে লাগল। এমন সময় অর্থাৎ ১৮৯৬ সালে এমনই একটি ঘটনা ঘটল যার ফলে জীবনে আর কোনোদিন তাঁকে পিছন ফিরে

তাকাতে হয়নি কিংবা সম্পাদক প্রকাশকদের দয়ার উপরেও আর নির্ভর করতে হয়নি।

উত্তর মেরু সংলগ্ন কানাডা ও আলাস্কার বরফ ঢাকা ক্লনডাইক ইউকন অঞ্চলে সোনা পাওয়া যাচ্ছে এমন একটি সংবাদ রটে যেতেই সারা আমেরিকা থেকে হাজার হাজার স্বর্ণলোভী মানুষ দলে দলে ছুটে চলছিল সেখানে সোনার সন্ধানে। অ্যাডভেঞ্চারের আহ্বানে রোমাঞ্চিত হয়ে জ্যাক লণ্ডনও ঐ স্বর্ণসন্ধানী অভিযানের শরিক হয়ে পরলেন। বেশ কিছুকাল ওখানে কাটিয়ে ফিরে এলেন সোনা হয়ত তিনি পাননি কিন্তু সোনার চেয়ে ও অনেক মূল্যবান একটি ডায়েরী নিয়ে এসেছিলেন সাথে করে। ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলেন ঐ সময়ের প্রতিদিনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও যাঁরা 'গোল্ডরাশ'-এর অনেক আগে থেকেই ওই অঞ্চলে ছিলেন তাঁদের কাছে শোনা নানান বিষয় ও অভিজ্ঞতার বিচিত্র কাহিনী। ওখানেই তিনি দেখেছিলেন প্রকৃতির কঠিন নিষ্করুন স্বরূপ, জীবন সংগ্রামের বাস্তবরূপ, বাঁচার সংগ্রামের একই সারিতে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুদের। বিন্দুমাত্র ভুল বা অসতর্ক কাজকর্ম প্রকৃতি ক্ষমা করে না। কৌশলী ও শক্তিশালীরা, যারা প্রকৃতির সাথে মানিয়ে চলতে পারে তারাই টিঁকে থাকে পৃথিবীর বুকে আর ঐ সময়ই তার হাতে ছিল ডারউইনের-'অরিজিন অব স্পিসিস্'। সেইসব ভয়াবহ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতারই ফসল 'কল অফ দ্য ওয়াইল্ড', 'দি সন অফ দ্য উলফ', 'হোয়াইট ফ্যাঙ' প্রভৃতি কালজয়ী গ্রন্থ।

জ্যাক লণ্ডন কিন্তু নিছক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীরই লেখক ছিলেন না। কঠিন জীবন সংগ্রাম ও দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়ে তার নগ্নরূপকে তিনি নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, দেখেছিলেন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কুৎসিৎ চেহারা, মানুষে মানুষে অসাম্য ও শোষণ। শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আমরণ সংগ্রাম করে গিয়েছেন। 'দ্য মিনিয়মস অফ মিডাস', 'দ্য ড্রিমস অফ ডেবস', 'দ্য আয়রণ হীল', 'দ্য মেক্সিকান', 'দি পিপ্‌ল অফ দি এ্যাবিস্', প্রভৃতি রচনার সূত্রে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহিত্যিক হিসেবে দুনিয়ার সাধারণ মানুষ ও শ্রমজীবি জনগণের প্রিয় লেখক তিনি। তার লেখা মানুষের প্রাণে নতুন আশা ও সংগ্রামের প্রেরণা জাগায়, জোগায় এগিয়ে চলার প্রেরণা।

বিয়ে করলেন ১৯০১ সালে বেস ম্যাডার্নকে, কিন্তু সম্পর্ক স্থায়ী হল না। একটি কন্যার জন্মের পর ঘটে গেল বিবাহবিচ্ছেদ। এর কিছুকাল পরে বিয়ে করেন চার্মিয়ান কিট্রেজকে, এ বিবাহ স্থায়ী হয় এবং দাম্পত্য জীবনে সুখী হন তিনি। লণ্ডনের বিবরণ সুদক্ষ শিল্পীর মতো। উত্তরের ভয়াবহ শীত কিংবা প্রশান্ত

মহাসাগরের টাইফুন যার চেয়ে ভয়াবহ জিনিস মানুষের অভিজ্ঞতায় আর কিছু নেই তা ও জ্যাক লণ্ডনের বর্ণনাগুণে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। এমনকি বাতাসকেও তিনি দৃশ্যমান করে তুলেছেন।

লণ্ডনের চরিত্রগুলো কেউ-ই আমাদের এখানকার পরিচিত জগতের নয় তবু তাদের কখনই অচেনা অবাস্তব বলে মনে হয় না। আসলে তাঁর দেখা ও উপলব্ধির জগতে তিনি পাঠককেও প্রতিমুহূর্তে সঙ্গী করে নিতে পেরেছেন। লেখক হিসেবে জ্যাক লণ্ডনের কৃতিত্ব এখানেই।

উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে লণ্ডন যতটা সার্থক তার থেকে অনেক বেশী সার্থক তিনি ছোট গল্পে, ছোটগল্পে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন তিনি। ভাষা, ভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে তাঁর অধিকাংশ গল্পই কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্থটিতে তাঁর বিখ্যাত দুটি রচনাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। একটি তাঁর সমুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অপরটি 'বক্সিং' খেলাকে কেন্দ্র করে রচিত। 'অ্যাবিসমাল ব্রুট' বা 'অপরাজেয়' তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'বক্সিং' সম্পর্কিত রচনাগুলির অন্যতম একটি ছোট উপন্যাস। জ্যাক লণ্ডনের চরিত্রের দুটি বিশেষ দিক এই উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে। প্রথমত তিনি ছিলেন 'ক্লীন স্পোর্টস্'-এর অনুরাগী আর দ্বিতীয়ত তাঁর সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। একজন বক্সার জীবনের ঝুকি নিয়ে রিং-এর মধ্যে প্রবেশ করে। প্রচণ্ড শক্তি ও কৌশলের ভয়াবহ যুদ্ধ সদৃশ স্পোর্টস-কে কেন্দ্র করে যে পরগাছা শ্রেণী মুনাফা লোটে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন তিনি, উম্মোচিত করেছেন পেশাদারি মুষ্টিযুদ্ধের ক্লেদাক্ত স্বরূপকে। অন্যটি তার মেলানেশিয়ায় সমুদ্র অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা একটি অনবদ্য গল্প।

এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয় ২২শে নভেম্বর, ১৯১৬ সালে। জন্মের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল না তাই মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন। অমিতবীর্য যৌবনের প্রতীক ছিলেন তিনি, সম্ভবত যৌবনকে তাই তিনি বার্ধক্যে প্রলম্বিত হতে দেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর এডউইন মারখাস অনেকটা এই ধরণের কথাই লিখেছিলেন : Jack London was a part of the youth and heroic courage of the world ; with his hassing the world was bereft of a flame.

॥ প্রথম প্রকাশ ॥
আশ্বিন ১৩৬১

॥ পর্যায় ক্রম ॥

উপন্যাস

অপরাজেয়

গল্প

অথৈ জলের ডাক ॥

অপরাজেয়

জ্যাক লণ্ডন

ভাষান্তর

অসীম চট্টোপাধ্যায়



দীপায়ন

২০ কেশব সেন স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ৭০০ ০০৯

ডাকে আসা চিঠিপত্রগুলোর ওপর দ্রুত চোখ বোলাচ্ছিলেন স্যাম্ স্টুব্নার। অর্থের জন্য যে-সব মুষ্টিযোদ্ধা রিং-এ লড়তে নামে, তাদের ম্যানেজারী করে স্যাম। কাজে কাজেই, উদ্ভট সব চিঠিপত্র হরবখতই তাঁর কাছে আসে। হরেক কিসিমের ছিটেল, লড়িয়ে, আধা-লড়িয়ে আর সমাজ সংস্কারকরা তাঁর কাছে বিচিত্র সব মতলব বাতলায়। কত কিছুই না আসে ডাকে! কেউ হয়ত চিঠিতে তাঁকে খুন করার দিব্যি আওড়ায়, কেউ বা পাঠায় ছোট্ট একটা হুমকি। তারপর ধরো না খরগোশের ঠ্যাং, পয়মন্ত ঘোড়ার নাল, আমন্ত্রণপত্র, কিম্বা হয়ত কোন অকালকুষ্মাণ্ড মতলববাজ একটা আড়াই-তিন লাখ ডলারের ভাঁওতাই ঝুলিয়ে দিল নাকের ডগায়! সব জানা আছে স্যামের। বয়সকালে তাঁর কাছে একবার ডাক মারফৎ হাজির হয়েছিল একখানা ক্ষুর শান দেওয়ার চামড়া আর একটা রোদ-পোড়া শুকনো খটখটে ফাটা আঙুল। একজন তরতাজা নিগ্রোর শরীর থেকে ছাড়িয়ে-নেওয়া চামড়া দিয়ে বানানো হয়েছিল ঐ শান দেওয়ার চামড়াটা, আর আঙুলটা কেটে নেওয়া হয়েছিল মৃত্যু-উপত্যকায় পড়ে থাকা জনৈক শ্বেতাঙ্গের হাত থেকে। তারপর থেকে ডাকে পাওয়া যে-কোন জিনিস দেখে এতটুকুও চমকান না স্যাম স্টুবনার! কিন্তু সেদিন সকালের একটা চিঠিতে যেন কিছুটা আনুসুর বাজল। চিঠিটা দুবার পড়ে পকেটে রাখলেন তিনি, খানিক পরে আবার সেটা বার করে পড়তে শুরু করলেন। সিস্কিয়ু জেলার কোন্ এক না-জানা-নাম ডাকঘরের ছাপ রয়েছে ওপরে। পত্রলেখক লিখেছেন:

প্রিয় স্যাম,

আমাকে তুমি চেনো না, তবে আমার খ্যাতির কথা হয়ত শুনে থাকবে। আমার অনেক পরে তুমি মুষ্টিযুদ্ধের জগতে এসেছিলে। বহুদিন আমি ও-সব লড়াই-টড়াই থেকে অনেক দূরে। তবে একটা কথা জেনো—ওখানকার খবর

আমি সবই রাখি। এর মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধের জগতে কী কী ঘটেছে না ঘটেছে, সব জানা আছে আমার। তোমার সম্বন্ধেই কোন্ কথাটাই বা জানি না! সেই একেবারে গোড়ার দিকে কাল্ আউফম্যান তোমাকে নক আউট করে দিয়েছিল। সেই থেকে শুরু করে ন্যাট বেল্সনের সঙ্গে তোমার শেষ লড়াই পর্যন্ত সবই আমার মগজে ঠাসা। আর এ লাইনে আজ অবধি যত ম্যানেজার দেখলুম, তাদের মধ্যে তোমাকেই আমার সেরা বলে মনে হয়। শোনো, তোমার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে। আমার হাতে আছে এক আশ্চর্য সম্পদ। না হে, কোন হেঁজি-পেঁজি মাল নয়। আচ্ছা ধরো একটা বাইশ বছরের ছেলে, যার ওজন হচ্ছে দুশো কুড়ি পাউণ্ড, আর আমি যৌবনকালে যত জোরে ঘুষি মারতে পারতুম তার চেয়ে ঠিক দ্বিগুণ জোরে সে ঘুষি মারতে পারে—চলবে? হ্যাঁ, আমার ছেলে, ছোট প্যাট গ্লেণ্ডন। ঐ নামেই লড়বে ও। সব আমি ছকে রেখেছি। এখন তোমার উচিত হচ্ছে হাতের কাছে পয়লা যে ট্রেনটা এদিকে আসবে, সেটাতে চড়ে সিধে আমার এখানে চলে আসা।

ওকে আমি বড় করে তুলেছি, লড়তে শিখিয়েছি। যেটুকু বিদ্যে মগজে ছিল, সব তিল তিল করে ঢেলে দিয়েছি। বললে হয়ত বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যি বলছি, আমি যেটুকু শিখিয়েছি, সেটুকু ছাড়া ও নিজে নিজেও অনেক কিছু শিখেছে। ছেলেটা জাত লড়িয়ে। ঠিক কোন্ সময়ে ঘুষি চালাতে হবে, উল্টোদিকের লড়িয়ের থেকে কতটা দূরে থাকতে হবে—এ-সব ব্যাপারে ওর মুন্শিয়ানা দেখলে চমকে যাবে তুমি। প্রত্যেকটা সেকেণ্ড, প্রত্যেকটা ইঞ্চি যেন একেবারে মুখস্থ। অন্যরা সপাটে ঘুষি কষিয়েও যা করতে পারে না, ও স্রেফ আধ হাত দূর থেকে একটা ঝাঁকি দিয়েই তা করতে পারে। উল্টোদিকের লড়িয়ে ঐ এক ঝাঁকিতেই ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে পড়ে।

এলাইনে শ্বেতাঙ্গদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক কথাই কানে আসে। এই ছেলের মধ্যেই রয়েছে সেই ভবিষ্যৎ। একবার এসে দেখে যাও অন্তত। তুমি যখন জেফ্রিদের ম্যানেজার ছিলে, তখন তো শিকার করতে খুব ভালবাসতে! চলে এসো। আমি তোমাকে এমন কিছু শিকার করার সুযোগ দেব, যার পাশে ঐ-সব ফিল্মী কাণ্ড-কারখানাকে একেবারে পান্শে মনে হবে। ছোট প্যাট গ্লেণ্ডনকে আমি তোমার সঙ্গেই পাঠিয়ে দেব। ওর ব্যাপারে এখন আর আমার কিছুই করার নেই। সেই জন্যেই এ চিঠি লিখলুম। এতদিন আমিই ওর সবকিছু

দেখা-শোনা করে এসেছি। কিন্তু আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে, যে-কোন সময় চোখ বুজতে পারি, কাজেই দেরী কোরো না। ওর দেখাশোনার ভার তোমার হাতেই তুলে দিয়ে যেতে চাই। তাতে তোমাদের দুজনেরই লাভের আশা ষোল আনা, তবে চুক্তিপত্রটা আমি করে দিয়ে যেতে চাই।

বিনীত

প্যাট গ্রেগুন

কেমন থতিয়ে গেছে স্টুব্‌নার। রসিকতা নয় তো? এ লাইনের লোকেরা রসিকতা করতে ওস্তাদ। চিঠিটার মধ্যে দোস্ত করবেট কিম্বা ফিজ্‌সিমন্‌স্‌-এর কোন কারসাজি নেই তো? কে জানে বাবা! কিন্তু চিঠিটা যদি সাচ্চা হয়, তাহলে ব্যাপারটা ঠিক হেলাফেলা করার মতো নয়। স্টুব্‌নারের আগেব যুগে লড়িয়ে ছিলেন প্যাট গ্রেগুন। খুব ছেলেবেলায় গ্রেগুনকে অবশ্য একবার দেখেছিলেন তিনি। জ্যাক ডেম্পসি-র সাহায্যার্থে একটা প্রদর্শনী লড়াইয়ে নেমেছিলেন গ্রেগুন। তখনই লোকে তাঁকে 'বুড়ো প্যাট' বলে ডাকত। লড়াইয়ের আসর থেকে তিনি তখনই অনেক দূরে। লণ্ডনের পুরনো আমলের মুষ্টিযুদ্ধের আইনমাফিক তিনি এমনকি স্থলিভানেরও আগের আমলেব মুষ্টিযোদ্ধা। তবে জীবনের শেষ ক'টা লড়াইতে যখন তিনি নামেন, তখন মুষ্টিযুদ্ধের জগতে মার্কুইস অফ কুইন্সবারির আইন চালু হয়ে গেছে।

মুষ্টিযুদ্ধের খোঁজ-খবর যারা রাখত, তাদের কাছে প্যাট গ্রেগুন তো খুবই পরিচিত নাম। তবে কিনা তাঁর সেরা সময়ে তাঁকে রিং-এ দেখেছে, এমন লোক আর ক'জনই বা বেঁচে আছে! আর শুধু রিং-এ-ই বা কেন, তাঁকে স্রেফ চোখে দেখেছে, এমন লোকের সংখ্যাও তো আজ হাতে গোনা যায়। তবু, মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে প্যাট গ্রেগুন একটা বিশিষ্ট নাম, তাঁকে বাদ দিয়ে খেলাধুলোর ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। গ্রেগুনের খ্যাতিটা বড বিচিত্র ধরণের। সে আমলে তাঁর থেকে বেশি সম্মান আর কেউ পেত না, অথচ জীবনে কোনদিন তিনি চ্যাম্পিয়ন হতে পারেন নি। বরাতটাই তাঁর মন্দ ছিল। লোকেও তাঁকে কপাল ভাঙ্গা যোদ্ধা বলেই মনে করত।

চার চারবার হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রায় দোরগোড়া থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল গ্রেগুনকে। অথচ ঐ চারবার তিনি জিততেই পারতেন। প্রথমবার চ্যাম্পয়নশিপ লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার ঠিক আগে সানফ্রান্সিসকো উপসাগরে একখানা বজরায় বেমক্কা ভেঙে বসলেন নিজের হাতটা।

দ্বিতীয়বারও একেবারে শেষ মুহূর্তে ভেঙে বসলেন একখানা পা, জোয়ারে ফুঁসে-ওঠা টেম্‌সের জলে লাফালাফি করতে গিয়ে। তৃতীয়বার টেক্সাসে ঘটল সেই ভুলতে-না-পারা ঘটনাটা! ঠিক যখন তিনি প্রতিপক্ষকে প্রায় ঘায়েল করে এনেছেন, তখনই রিং-এর মধ্যে পুলিস ঢুকে পড়ল হুড়মুড় করে। শেষবারের লড়াইটা হয়েছিল সানফ্রান্সিসকোর মেকানিক্‌স্ প্যাভিলিয়নে। সেবারে শয়তান রেফারিটা তাঁকে সারাক্ষণ অন্যদের চোখ আড়াল করে তীক্ষ্ণ একটা কিছু দিয়ে সমানে খোঁচা মারছিল। এর পেছনে বোধহয় জুয়াড়িদের সিণ্ডিকেটের হাত ছিল। তবু থামানো যায়নি গ্রেগুনকে। প্রতিপক্ষের চোয়ালে একটা ডানহাতের আর পেটের কাছে বাঁ হাতের হাতুড়ি কষিয়ে চিৎ করে দিয়েছিলেন তাকে। সেই সময় আগ্ বাড়িয়ে সেই রেফারিপুঙ্গব, ঠাণ্ডা মাথায় ঘোষণা করল—ফাউল করার অপরাধে প্যাট গ্রেগুনকে বাতিল করা হল। রিং-এর কাছাকাছি থাকা প্রতিটি দর্শক, প্রতিটি ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞ আর গোটা ক্রীড়াজগৎ জানত—কোনরকম ফাউল করেননি প্যাট গ্রেগুন। তবু, সমস্ত মুষ্টিযোদ্ধার মতোই, রেফারির সিদ্ধান্তকে ঠাণ্ডা মাথায় মেনে নিয়েছিলেন তিনি—ঠিক যেমনভাবে মেনে নিয়েছিলেন নিজের যাবতীয় দুর্ভাগ্যকে।

এই হচ্ছেন প্যাট গ্রেগুন। স্টুবনারের মাথায় এখন একটাই ভাবনা: চিঠিটা প্যাটই লিখেছেন তো? চিঠিখানা পকেটে পুরে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে চললেন স্টুবনার। খেলাধুলোর জগতের যার সঙ্গেই দেখা হল, তাকেই শুধোলেন—আচ্ছা, প্যাট গ্রেগুনের শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল, বলতে পারো? কেউই কোন হদিশ দিতে পারল না। জনাকতক বলল—অ্যাদ্দিনে নিশ্চয় মারা-টারা গেছেন। জোর দিয়ে কেউই কিছু বলতে পারল না। এক প্রাভাতিক সংবাদপত্রের মুষ্টিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক ফাইলপত্র ঘেঁটে জানালেন—না, তাঁর মারা যাওয়ার খবর কোথাও নেই। শেষমেষ টিম্ দোনোভান যা-হোক একটা হদিশ বাতলাল,—

'না না, মারা উনি যাননি। যে মানুষটা জীবনে কোনদিন মদ ছোঁয়নি, নেশা-ভাঙ্ করে নি, সে এত সহজে পট্ করে অমনি অমনি মরে যেতে পারে কখনো? জীবনে ঢের টাকা-পয়সা কামিয়েছিলেন উনি, আর সে-সব তাল ঠুকে ফুঁকে-ফাঁকে উড়িয়ে দেননি জমিয়ে রেখেছিলেন। তারপর সে-সব টাকা ব্যবসাপত্রে ঢাললেন। আরে উনি তিন-তিনখানা মদের দোকান দিয়েছিলেন কি ওম্‌নি ওম্‌নি! সেগুলো বিক্‌কিরি করে দেয়ার আগে কাঁড়ি-

কাঁড়ি টাকা রোজগার করে নিয়েছিলেন, হ্যাঁ। ঐ-সব দোকানদাড়ি বেচে দেবার সময়ই তাঁর সঙ্গে আখ্‌রি বার দেখা হয়েছিল আমার। তা হবে, ধরো না কেন কুড়ি বছর কি তারও বেশি হয়ে গেল। ওঁর বৌ তখন সবে মারা গেছে। ফেরীঘাটে যাবার রাস্তায় ওঁর সঙ্গে মোলাকাৎ হয়েছিল আমার। আমি শুধোলুম—আরে বুড়ো ওস্তাদ, চললে কোথায়? তা উনি বললেন—আমি এ জায়গা ছেড়ে গাঁয়ে চলে যাচ্ছি টিম্, বিদায়। তারপর থেকে আজ তক্ আর দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে। তবে জোর দিয়ে বলতে পারি ভায়া, মারা উনি যাননি।'

স্টুবনার জিজ্ঞাসু, 'আচ্ছা, আপনি বললেন, তখন ওনার স্ত্রী সবে মারা গেছলেন। তো, ওনার কোন ছেলেপুলে ছিল কিনা জানেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা বাচ্চা ছিল বটে। সেটাকে কোলে বসিয়েই তো ফেরীঘাটের দিকে যাচ্ছিলেন উনি।'

'বাচ্চাটা কি ছেলে ছিল?'

'অ্যাই মুস্কিল! তা কি করে জানবো বলো দিকিন্?'

সেই মুহূর্তেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন স্যাম স্টুবনার। সেদিন রাত্রেই চড়ে বসলেন উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার বনাঞ্চলগামী একটা ট্রেনে।

ডিয়ার লিক্-এ আর একটা ভোর জন্ম নিচ্ছে। ট্রেন থেকে নামলেন স্টুবনার। কোন দোকানপাটের ঝাঁপ খোলনি এখনও। একটা ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হল স্টুবনারকে। শেষমেষ এক দোকানী ঝাঁপ তুলল। তৎক্ষণাৎ মুখ বাড়ালেন স্টুবনার। না, দোকানদার প্যাট গ্রেগুনের নাম-টাম শোনেনি কখনও। ঐ দিকেরই বাসিন্দা যদি হন সে ভদ্রলোক. তাহলে দূরে কোথাও ঘর-গেরস্তি পেতেছেন হয়ত। দোকানের কর্মচারীটিও প্যাট গ্রেগুনের নাম জীবনে শোনেনি। হোটেলে গিয়ে খোঁজ-খবর করলেন স্টুবনার। নাহ্, পাত্তা মিলল না কিছু। ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে শেষে হদিশ মিলল গুদামরক্ষক আর পোস্টমাস্টারের কাছে। আরে হ্যাঁ, চিনি বৈকি প্যাট গ্রেগুনকে, একশবার চিনি। ঠিক এই ডিয়ার লিকে অবশ্য ওনার আস্তানা নয়, আরও কিছুটা উজিয়ে যেতে হবে স্টুবনারকে। একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে পৌছতে হবে আল্পাইনে। তা, মাইল চল্লিশেক পথ তো হবেই। ওখানে অনেকে বেড়াতে-টেড়াতে যায়। তারপর আল্পাইন থেকে ঘোড়ায় চড়ে অ্যান্টিলোপ উপত্যকা হয়ে ভালুক খাড়ি পার হয়ে এগুতে হবে। ঐখানেই কোথাও থাকেন প্যাট গ্রেগুন। ও আল্পাইনের লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। হ্যাঁ, ওনার একটা ছেলে আছে বটে। গুদামরক্ষক তাকে দেখেওছে. বছর দুয়েক আগে সেই ছেলে একবার এসেছিল ডিয়ার লিকে। বুড়ো প্যাট অবশ্য বছর পাঁচেক এ ধার মাড়াননি। এখানকার দোকান থেকেই মালপত্তর কিনতেন তিনি, আর সবসময় দাম মেটাতেন চেক-এ। মাথার চুলগুলো সব পেকে শাদা হয়ে গেছে একেবারে। এর বেশি কিছু আর জানা নেই গুদামরক্ষকের. তবে আল্পাইনের লোকজনরা নিশ্চয়ই ঠিকঠাক পথ বাতলাতে পারবে।

এই খবরটুকুই চনমনে করে তুলল স্টুবনারকে। যাক, তাহলে ছোট প্যাট গ্রেগুন বলে একজন আছে, আর বড় প্যাট গ্রেগুনও বেঁচেই আছেন! সে রাতটা স্টুবনার আল্পাইনেই কাটালেন। পরদিন ভোরেই যাত্রা শুরু করলেন

অ্যান্টিলোপ উপত্যকার পথে। পেরিয়ে গেলেন ভালুক খাঁড়ি। এত অরণ্যময় অঞ্চল আগে কখনো দেখেন নি স্টুবনার। সারাটাদিন ঘোড়া ছুটিয়ে সাঁঝের মুখে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন পিন্টো উপত্যকায়। ভীষণরকম খাড়াই আর সরু ছিন্‌ছিনে রাস্তা। মাঝে-মাঝেই ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটতে হচ্ছে তাঁকে।

ঠিক এগারোটার সময় একটা কাঠের বাড়ির সামনে ঘোড়া থেকে নামলেন স্টুবনার। অপরিচিত গন্ধ পেয়ে গর্জন করে উঠল দুটো শিকারী কুকুর। চমৎকার অভ্যর্থনা। তারপরই খুলে গেল দরজাটা বেরিয়ে এলেন প্যাট গ্রেগুন, জড়িয়ে ধরলেন স্টুবনারকে, হাত ধরে নিয়ে গেলেন বাড়ির মধ্যে।

'আমার মন বলছিল স্যাম, তুমি ঠিক আসবে।' বলতে বলতে আগুন জ্বালালেন প্যাট, কফি চড়ালেন, ঝল্‌সাতে দিলেন এক ফালি ভালুকের মাংস। 'আজ রাত্তিরে ছেলেটা ঘরে ফিরবে না, বুঝলে। আসলে মাংস-টাংস সব ফুরিয়ে গেছে। তো সাঁঝ নাগাদ ও বেরুল একটা হরিণ মেরে আনার জন্যে। থাক, আর বেশি কিছু বলব না। নিজের চোখেই দেখবে সব। সকাল বেলাই ফিরে আসবে তখন বাজিয়ে দেখো না হয়। ঐ যে, ওর দস্তানা জোড়া দেখতে পাচ্ছো? আচ্ছা, যাক্‌গে, দেখবে তো সবই।

'আর আমার কথা যদি বলো, তাহলে দেখতেই পাচ্ছো, শেষ হয়ে গেছি একেবারে। এই সামনের জানুয়ারিতে একাশি বছরে পা দেবো। একজন পুরনো লড়িয়ের পক্ষে বয়েসটা নেহাত কম নয়, কী বলো? কিন্তু, জানলে স্যাম, আমি কখনো নিজেকে নষ্ট করিনি, ফাঁকি দিই নি। সারা জীবনটাকে খুব ভালভাবে কাজে লাগিয়েছি। আমাকে দেখেই তো সেটা বুঝতে পারছ, নাকি! ছেলেটাকেও ঠিক সেভাবেই তৈরী করেছি আমি। ভাবতে পারো, একটা বাইশ বছরের তাগড়া জোয়ান জীবনে কোনদিন মদ ছোঁয়নি, সিগারেট ফোঁকেনি! হ্যাঁ, এই হচ্ছে আমার ছেলে। ঠিক যেন দৈত্য একটা, জীবনে এতটুকু বেতাল হয় নি কখনো। সবুর করো, ও এসে তোমাকে হরিণ শিকার করতে নিয়ে যাবে'খন। দেখো, তোমাকে একেবারে চাঙ্গা করে দেবে ও, শিকারের যতেক সাজ-সরঞ্জাম নিজেই বইবে ঘাড়ে করে, আর ফেরার সময় নির্ঘাৎ একখানা পেল্লাই সাইজের মদ্দা হরিণ কাঁধে ফেলে নিয়ে আসবে। এখানকার এই খোলামেলা প্রকৃতির মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছে ও। কি শীত কি গ্রীষ্ম, কোনদিন খোলা আকাশ ছাড়া ছাদের নিচে শোয় নি ও। আমি ওকে শিখিয়েছি—এই খোলামেলা প্রকৃতিই তোমার ঘর-বাড়ি। তা-ই শিখেছে ও।

আমার শুধু একটাই চিন্তা। শহরে গিয়ে ঐ-সব তালঢ্যাঙা বাড়িগুলোতে ও ঘুমোবেই বা কী করে আর লড়াইয়ের সময় রিং-এর চারপাশে তামাকের কড়া গন্ধটাই বা সহ্য করবে কী করে? ধরো একেবারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে, একটু ভাল করে শ্বাস নেবার জন্যে প্রাণ আইঢাই করছে, আর তখন চারপাশে ভোঁসভোঁস্ করে সবাই তামাকের ধোঁয়া ছাড়ছে! ওঃ, সে যে কী ভয়ঙ্কর! নাহ্, আজ থাক, আর বক্‌বক করব না। অদ্দূর থেকে এসেছো, খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছো নিশ্চয়ই ঘুমে চোখ টেনে আসছে তোমার। রাতটা একটু সবুর করো, তারপর নিজের চোখেই দেখবে। একটু শুধু সবুর করো।'

থামলেন প্যাট। কিন্তু বুড়ো বয়সের বকবকানির অভ্যেস যাবে কোথায়! স্টুবনার সবে দু'চোখের পাতা এক করার জন্য হেলান দিয়ে বসেছে, ফের শুরু হল তাঁর বাক্যের-ছড়রা।

'ছেলেটার দম আছে বটে, বুঝলে! একটা হরিণকে এক নাগাড়ে তাড়া করে করে নাজেহাল করে দিতে পারে। আসলে এ-ই তো হচ্ছে শিকারীদের জীবন, এভাবেই মজবুত হয়ে ওঠে ফুসফুসটা। এসব ছাড়া অন্য কিছু তেমন জানে-টানে না ও, তবে অবরে-সবরে খানকতক কবিতায় বই-ফই পড়ে বটে। একেবারে খাঁটি প্রকৃতির সন্তান যাকে বলে। সে তুমি ওকে এক ঝলক দেখলেই বুঝতে পারবে! একটু যেন উদাস-উদাস ধরণের। মাঝে-মাঝে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়। আমার তো মনে হয় পাহাড়ে পরী-টরী খোঁজে ও। এই জঙ্গল, পাহাড়, প্রকৃতি—এ-সবকিছুকে ও ভীষণ ভালবাসে, মানে যাকে প্রকৃতি প্রেমিক বলে আর কি, অবশ্য এই প্রকৃতি ছাড়া ও তো অন্য কিছু জানে না। শহরকে ওর ভীষণ ভয়। বই-পত্তোরে শহরের কথা কিছু কিছু পড়েছে ও, তবে আমাদের ঐ ডিয়ার লিক্-এর থেকে বড় কোন শহর আজ পর্যন্ত চোখে ছাখেনি! শহরের লোক-ঠাসা ভীড়ভাড়ক্কা একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না ছেলেটা। ডিয়ার লিক্ থেকে ফিরে এসে ও বলেছিল, শহরের লোকগুলো হচ্ছে অকম্মার ধাড়ি। জীবনে সেই একবারই ও রেলগাড়ি দেখেছে, মটোর দেখেছে। তা সে ধরো না দু'বছর হয়ে গেল।

'এই খোলামেলা প্রকৃতির মধ্যে থাকতে থাকতে ওর একটা আলাদা জোর এসে গেছে, বুনো ষাঁড়ের মতো শক্তি এসে গেছে। কোন শহুরে আদমী ওর ধারে-কাছেও আসতে পারবে না। হ্যাঁ, মেনে নিচ্ছি, জোয়ান বয়সের জেফ্রি ওর সঙ্গে লড়লে পরে ওকে একটু-আধটু বেগ দিত। তা দিত। কিন্তু

ঐ একটু-আধটুই। ছেলেটা ইচ্ছে করলে জেফ্রিকে প্যাকাটির মতন মট্ করে ভেঙে ফেলতে পারত। অথচ ওকে দেখলে কিন্তু ওরকমটা মনে হবে না! এইটেই বড় তাজ্জব ব্যাপার। দেখলে মনে হবে, ছেলেটার গায়ে কিছুটা জোর-টোর আছে, ব্যস। কিন্তু ওর ঐ পেশী, ঐ পেশীর জোরেই ও বাজা। কত আর বলব, নিজেই বাজিয়ে দেখে নিয়ো'খন।

'ও কী কী ভালবাসে, শুনবে? ও ভালবাসে ফুল, সবুজঘাস, ভালবাসে রাতের বেলায় পাইন গাছের পেছনপানে ফুটে ওঠা হলুদ চাঁদ, সাঁঝের বেলায় আকাশ রাঙিয়ে সুয্যি-ডুবন্ কিম্বা সেই কাক-ভোরে উঠে দূর পাহাড়ের ওপর থেকে সুয্যিটার টপ্ করে লাফিয়ে ওঠা দেখতে। আর ছবি আঁকতে যে কি ভালবাসে, সেটা তুমি ওর নেশাই বলতে পারো। আর স্কুলের ঐ লালচুলো দিদিমণিটা আবার ওকে কী-সব কবিতার বই-পত্তোর দিত, তা থেকে মাঝে-মাঝে একা একা আবৃত্তি করে—'শুকতারা, না এই রাত!' আসলে বয়সটা যে কাঁচা, বুঝলে না! একবার লড়াই শুরু করলে কিন্তু ঠিক লেগে থাকবে, দেখে নিও তুমি। তবে কিনা, শহরে তো কখনো থাকেনি, প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হবেই। সেদিকে একটু নজর রেখো শুধু।

'ও হ্যাঁ, আর একটা ভাল খবর দিয়ে রাখি এই বেলা। মেয়েদের ব্যাপারে···ও কিন্তু খুব লাজুক, ওদেরকে সবসময় এড়িয়ে চলারই চেষ্টা করে। তা এখন অন্তত বেশ কয়েক বছর যে ও-সব কারবারে ছোকরা মাথা ঘামাবে না, এই এক কলম লিখে দিলুম। আসলে এখনও ও মেয়েছেলেদের ঠিকমতো বুঝে উঠতেই পারে না। আর জীবনে খুব বেশি মেয়েছেলেকে দ্যাখেও নি ও। ঐ স্যাম্‌সন্'স ডাঙার দিদিমণিটাই ওর মাথায় যা একটু কিছু কবিতার পোকা ভরে দিয়েছিল। মেয়েটা নির্ঘাৎ ওর প্রেমে পড়েছিল, কিন্তু ছেলেটা কোনদিন সেটা বুঝে উঠতেই পারল না। বিপজ্জনক মেয়ে যা একটা কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছিল। ও কিন্তু এখানকার পাহাড়ী মেয়ে নয়, ওদের বাড়ি ছিল নিচের সমতলের দিকে। কিছু দিন যেতে না যেতে হয়ে উঠল একেবারে বেহায়ার মতো ঘুরঘুর করত ছেলেটার আশপাশে। তো, ও যেন একেবারে মরিয়া হয়ে ছেলেটা তখন কী করল জানো? ভয়ে একেবারে খরগোশের মতন সিঁটিয়ে গেলো, তারপর হটাৎ একদিন তল্পিতল্পা গুটিয়ে, কাঁথা-কম্বল পিঠে বেঁধে আর বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে সিধে পগার পার। একেবারে পাহাড়ের উপরে গভীর জঙ্গলে সেঁধিয়ে গেলো, বুঝলে! মাসখানেক আর এ-মুখো হয়নি। তারপর একদিন রাত্তিরে গা-ঢাকা দিয়ে ফিরলো, ফের

ভোরবেলা উঠেই দে দৌড়। মেয়েটা গাদাগুচ্ছের চিঠি-পত্তোর দিয়ে যেত ওর জন্যে, ছেলেটা একবার ছুঁয়েও দেখত না। আমাকে বলে যেত—পুড়িয়ে ফেলো ওগুলো। আমিও দিতুম টান মেরে আগুনে ফেলে। তারপর দু'দুবার মেয়েটা সেই স্যাম্‌সনের ডাঙা থেকে ঘোড়ায় চেপে এখানে টর খোঁজে এসেছিল, এতটা রাস্তা ঠেঙিয়ে। সত্যি চলছি স্যাম, মেয়েটার জন্যে তখন আমার বেশ দুঃখুই তো। ছেলেটার জন্যে একেবারে হেদিয়ে মরছিল ও, সে ওর চোখ-মুখ দেখলেই টের পাওয়া যেত। মাস তিনেক পরে হাল ছেড়ে দিল তারপর, ইস্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়ে একেবারে নিজের গাঁয়ে ফিরে গেল। ও যেতে তবে ঘরে ফিরল ছেলেটা।

'ওহ্, এই মেয়েছেলেরা কত লড়িয়ের জীবনকে না একেবারে ঝরঝরে করে দিয়েছে। তবে ওর গায়ে এতটুকু আঁচও ওরা লাগাতে পারবে না, হ্যাঁ এই বলে দিলুম আমি। কোন অল্পবয়সী ছুক্‌রি যদি ওর দিকে দুবার তাকায় কিম্বা প্রথম-বারেই যদি অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে, তাহলে ঠিক মেয়েদের মতনই লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে ও। আর ব্যাপারটা কী জানো, দুনিয়াশুদ্ধ সব মেয়েই ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু ও যখন লড়তে নাবে···ওহ্, সে বলে বোঝাতে পারব না তোমাকে। তখন যেন সেই পুরনো আমলের আইরিশ লড়িয়ে এসে ভর করে ওর ওপর, ওর হয়ে যেন ঘুষিগুলো চালায়! না, তাই বলে মাথা গরম করে না মোটেই, কক্ষনো না। আমার সেরা সময়েও ওর মতন ঠাণ্ডা মাথায় লড়তে পারতুম না আমি। এখন কী মনে হয় জানো? মনে হয় রেগে-মেগে মাথা গরম করে ফেলার জন্যেই আমার ঐ-সব দুর্ঘটনাগুলো ঘটেছিল। আর ও? ও যেন ঠিক একটা বরফের চাঁই। ওর মধ্যে তুমি একই সঙ্গে গরম আর ঠাণ্ডাভাব দেখতে পাবে। মানে, ধরো না কেন, একটা বরফের বাক্সের মধ্যে ইলেকট্রিকের তার জড়ানো থাকলে যেমন হয় আর কি।'

বেশ ঝিমুনি এসে গিয়েছিল স্টুবনারের। কিন্তু বৃদ্ধের বক্‌বকানির ধাক্কায় ঝোঁকটা কেটে গেল। মাথার মধ্যে ঘুম-ঘুম আবেশ। বৃদ্ধের কথকতা চলতে লাগল অনর্গল।

'হ্যাঁ, ওকে আমি সাচ্চা পুরুষমানুষ করে গড়ে তুলেছি, একেবারে খাঁটি একশভাগ পুরুষ! মুঠো-বাঁধা দুখানা হাত, একজোড়া টানটান পা আর দুটো তীক্ষ্ণ চোখ—আর কী চাই! বুঝলে, বক্সিং আমার নখদর্পণে, সব খোঁজ রাখি

আমি, এই হাল আমলে কী হচ্ছে না হচ্ছে, তা-ও জানা আছে সব। গুঁড়ি মেরে বসে পড়ার কায়দা? হুঁঃ. সব কায়দা-কানুন ওর মগজে ঠাসা। নিজেকে কখন কতটা উজাড় করে দিতে হবে, ও জানে। যেখানে দেড় ইঞ্চি সরলে কাজ চলে যায়, সেখানে কক্ষনো দু ইঞ্চি সরবে না ও। আবার ইচ্ছে করলে মদ্দা-ক্যাঙারুর মতন তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠতেও ওস্তাদ। একেবারে গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে লড়ার কথা বলছো? দেখবে দেখবে, স-ব দেখবে। দূর থেকে যা লড়ে, তারচে' কাছ থেকে আরো ভালো লড়ে, হুঁ! পিটার জ্যাকসনের সঙ্গে লড়ে যেতে পারত, তুঙ্গে-থাকা করবেটকে নাকাল করে ছাড়তে পারত, বুঝলে! সব শিখিয়েছি আমি ওকে, স-ব। আর ও নিজে শিখেছে আরো বেশি। বক্সিংয়ের সর্বকালের একটা প্রতিভা ও। এখানকার জনকতক গাঁট্টাগোট্টা পাহাড়ী লোকের সঙ্গে ও বক্সিংয়ের অভ্যেস করে। আমি ওকে সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কায়দা-কসরৎ শিখিয়েছি, কিন্তু ওরা ওকে কোনো রেয়াৎ করেনা, ইচ্ছেমতন মেরে চলে। না না, এ লোকগুলো এমন কিছু ওস্তাদ নিয়ম মানা লড়িয়ে না। ঘুষি মারতে গেলে সাপ্টে ধরে, তাড়া করলে এদিক-ওদিক দোলে। বলতে পারো বুনো ষাঁড়, কিম্বা পাঁশুটে ভালুক। জংলী শক্তির এক একটা পাহাড়, কিন্তু ওদের নিয়ে ছেলেখেলা করে ও। বলি শুনতে পাচ্ছো? ছেলেখেলা করে, ছেলেখেলা! মানে তুমি আমি যেমন কুকুরছানাদের নিয়ে ছেলেখেলা করি, তেমনি! বুঝলে!

খানিক পরে আবার ছিঁড়লো স্টুবনারের ঘুম-পর্দা। বৃদ্ধ তখনও বলেই চলেছেন: 'কিন্তু, মজার ব্যাপার কী জানো, ছেলেটা এইসব লড়াই-টড়াইকে মোটে আমলই দিতে চায় না। ব্যাপারটা ওর কাছে এতই সোজা যে গোটা ব্যাপারটাকে ও নেহাৎ ছেলেখেলা বলেই মনে করে। দাঁড়াও, খুব চটপটে কোন লড়িয়েকে ওর মুখোমুখী ফেলে দাও, তারপর দেখবে খেল্। হ্যা, সবুর। ওর হাতে পড়লে সব বাছাধন একেবারে ঠাণ্ডা মেরে যাবে। যতই কায়দা-কানুন শিখে আসুক সে, সব ফুঁ-ফুঁ করে ছেড়ে দেবে একবারে। এ জিনিস তুমি জন্মে ছাখো নি ভায়া একথা আমি হলপ করে বলতে পারি!'

ভোর। পাহাড়ের শরীর-ভরা কাঁপাকাঁপা হিম ধুসর ভোর। প্যাট গ্রেগুনের ডাকে ঘুম ভাঙল স্টুবনারের। তাঁর কানের কাছে বৃদ্ধের ফ্যাসফেসে গলার ফিসফিস, 'ওঠো স্যাম, ওঠো। ও আসছে! বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, চোখে মেলে দেখে নাও বক্সিং জগতের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে। হাজার বছরের মধ্যে এমন যোদ্ধা আর জন্মাবে না। ওঠো স্যাম, দেখে নাও।'

দু'হাতে চোখ রগড়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকালেন স্টুবনার। রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে এক নওজোয়ান, হ্যাঁ দৈত্যই বলা যেতে পারে ওকে। এক হাতে রাইফেল, আর কাঁধে একটা পেল্লাই মাপের মদ্দা হরিণ অবহেলায় ফেলা। চলার ছন্দে কিন্তু কাঁধের ঐ বিপুল বোঝার কোন ছাপ নেই! গায়ে একটা নীলরঙা ওভারঅল, আর পশমী জামা। বুকের কাছটা খোলা। এই কনকনে ঠাণ্ডাতেও গায়ে কোন কোট নেই, আর পায়ে মজবুত জুতোর বদলে রয়েছে হাতে তৈরী কাঁচা হরিণের চামড়ার জুতো। চলার ভঙ্গীটা অত্যন্ত সাবলীল, অনেকটা বেড়ালের মতো! ওর শরীরের ওজন যে প্রায় দুশো পাউণ্ড (তার ওপর ঘাড়ে ঐ হরিণ), তা হাঁটাচলা দেখে বোঝার উপায় নেই। প্রথম দর্শনেই স্টুবনার মুগ্ধ। হ্যাঁ, এ ছেলে মারাত্মক তো বটেই, কিন্তু সেই সঙ্গেই এর সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে কেমন এক অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ছাপ। এ একেবারেই আলাদা ধাঁচের জিনিস, আর পাঁচটা মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে এর কোথাও মিল নেই। কেমন একটা বন্য-বন্য গন্ধ, সহজ সাবলীল, প্রকৃতি হাতে বেড়ে ওঠা। দেখলেই মনে হয়—এ ছেলে এই বিংশ শতাব্দীর বাসিন্দা নয়, এ যেন বহুপ্রাচীন কোন রূপকথা কিম্বা লোককথার গভীর থেকে উঠে আসা কোন রাত-চরা যোদ্ধা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টুবনার বুঝে নিলেন—এই ছোট প্যাট গ্রেগুন খুব কম-কথার-মানুষ। বৃদ্ধ প্যাট যখন ওর সঙ্গে স্টুবনারের পরিচয় করিয়ে দিলেন, তখন ও তাঁর সঙ্গে করমর্দন করল বটে, কিন্তু একটাও শব্দ উচ্চারণ করল না। করমর্দন সেরে চুপচাপ আগুন জ্বেলে প্রাতরাশ বানাতে বসে পড়ল। বাবার

মুখে হরেক সওয়াল, ও সেগুলোর জবাব দিয়ে গেল এক একটা কথায়। যেমন,—
বৃদ্ধ শুধোলেন, হরিণটা ও কোথায় পেল!
'সাউথ ফর্ক-এ'—ছেলের জবাব।
'বুঝলে স্টুবনার, ঐ সাউথ ফর্ক জায়গাটা হচ্ছে পাহাড় ডিঙিয়ে আরও এগার মাইল দূরে', গর্বভরে ব্যাখ্যা দিলেন বৃদ্ধ, 'আর যা রাস্তা না, দম ছুটে যাবে একেবারে, হ্যাঁ!'
প্রাতরাশ বলতে কড়াকালো কফি, টকে-যাওয়া ময়দার রুটি, আর কাঠকয়লার আঁচে ঝলসানো প্রচুর পরিমাণে ভালুকের মাংস। ছোট গ্রেগুন মাংসটা খেল গোগ্রাসে। খেতে খেতে একটা জিনিস বুঝতে পারলেন স্টুবনার—এরা বাপ-ছেলে দুজনেই প্রায় আধকাঁচা ঝলসানো মাংস খেতেই অভ্যস্ত। বৃদ্ধ প্যাট বকবক করেই চললো, তবে আসল কথাটা পাড়লো খাওয়ার পর।
'প্যাট, ইনি কে বুঝতে পারছিস?'
ঘাড় নাড়ল প্যাট, আর চকিতে একবার সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখে নিল স্টুবনারকে।
'আচ্ছা। তা শোন্, ইনি তোকে সঙ্গে করে সানফ্রান্সিসকোয় নিয়ে যাবেন।'
'আমি এখানেই থাকব, বাবা।'
বেশ হতাশ হয়ে পড়লেন স্টুবনার। নাহ্,এ যেন বুনো হাঁসের পিছনে ছোটা। ছেলেটার মধ্যে লড়াইয়ের জন্যে কোনরকম ছটফটানিই নেই কেমন যেন ঠাণ্ডা। ওর হাত-পায়ের ঐ শক্তপোক্ত পেশীগুলো কোন্ কাজেই বা লাগবে! ও তো অনেকেরই থাকে। বড়সড় চেহারার লোকেদের গায়ে কিছু মাংশ চর্বি থাকবে, এ আর নতুন কথা কি!
বৃদ্ধ প্যাট গ্লেগুনের কেল্‌ট্‌সুলভ ক্রোধ ঝল্‌সে উঠলো কঠোর কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল কর্তৃত্বের স্বর, 'না, তা হবে না। তোকে শহরে গিয়ে লড়াই করতেই হবে। এতদিন ধরে আমি সেই জন্যেই তোকে সব শিখিয়েছি, এখন আর পিছোনো চলবে না, বুঝেছ।'
'বেশ, যাব'—অপ্রত্যাশিত উত্তরটা যেন নিস্পৃহভাবে ঠেলে উঠল তরুণ প্যাটের চওড়া বুকের গভীর থেকে।
বৃদ্ধ যোগ করলেন, 'আর ওখানে যেয়ে লড়তে হবে বাঘের মতোন।'
না, তরুণটির চোখে কোন আগুনের-ঝলক ফুটে উঠল না। আবার হতাশ হলেন স্টুবনার। তরুণ প্যাট শুধু বলল, 'বেশ। তাহলে আমরা কখন রওনা হব?'

'ব্যাস, কথা পাকা স্যাম। তবে যাবার আগে ও একটু মাছ-টাছ ধরবে, আর তোমার সঙ্গে একহাত লড়ে নেবে। কি, রাজি?' বলতে বলতে স্টুবনারের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন স্টুবনার।

বৃদ্ধ খুশি, 'তাহলে এখন জামা-কাপড় পাল্টে তোমার কেরামতি দেখাও একটু।'

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই স্যাম স্টুবনারের সব সন্দেহের নিরসন হয়ে গেল। তিনি নিজে একজন প্রাক্তন মুষ্টিযোদ্ধা, তাও আবার হেভিওয়েটের। কাজেই মুষ্টিযোদ্ধাদের জাত চিনতে তাঁর কোন অসুবিধে হয় না। না, এ জিনিস তিনি জীবনে দেখেন নি, এর সব কিছুই আলাদা।

বৃদ্ধ বলছিলেন, 'ওর শরীরটা কত মসৃণ দেখছো! কোথাও ডুমো ডুমো পেশীর কৃত্রিম ব্যাপার নেই, এই হচ্ছে খাঁটি চেহারা। ওর কাঁধের ঢালটা দেখো। আর বুকটা একেবারে চকচক করছে যেন। বুঝলে স্যাম, তোমার সামনে এখন এমন একজন লড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেমন লড়িয়ে তুমি আগে কোনদিন দেখো নি। ওর শরীরের প্রতিটা পেশী একেবারে নিখুঁত। না হে না, এ কোন ভারোত্তোলক কিম্বা ব্যায়ামবীরের ব্যায়াম করে তৈরী করা শরীর নয়। দেখো দেখো, ওর মোটা মোটা পেশীগুলো কেমন বিজলির মতোন ঝলসে ওঠে। বললে ও এক্ষুনি টানা চল্লিশ রাউণ্ড কি একশ রাউণ্ডও লড়ে যেতে পারে। নাও, শুরু করো। টাইম!'

শুরু হল লড়াই। এক এক রাউণ্ড তিন মিনিট করে, আর প্রতি রাউণ্ডের পর এক মিনিট করে বিশ্রাম। কিছুক্ষণ লড়ার পরই চোখ খুলে গেল স্টুবনারের। না, ও-সব পেশী-ফেশী নয় কিম্বা নিস্পৃহতাও নয়। শুধু ঘুষি আর কৌশলের অলস, শান্ত খেলা, আর ওর প্রতিটা আঘাত বা আত্মরক্ষায় মিশে আছে একটা চটপটে অনমনীয়তা, কঠোর তীক্ষ্ণতা। অত্যন্ত সুশিক্ষিত, দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জাত লড়িয়ে ছাড়া এ জিনিস সম্ভব নয়।

'আরে রয়ে-সয়ে, রয়ে-সয়ে', হুঁশিয়ারি দিলেন বৃদ্ধ গ্লেণ্ডন, 'স্যামের কি আর সে দিন আছে।'

এই কথাটা শুনেই জ্বলে উঠলেন স্টুবনার (আর সেইজন্যেই তো কথাটা বলা!) নিজের সেই সুবিখ্যাত কৌশল আর একান্ত প্রিয় পাঞ্চটা কাজে লাগালেন তিনি—মাথায় মারার ভান করে, ডান হাতে সপাটে ঘুষি চালালেন পেটের দিকে। কিন্তু অত দ্রুততা সত্ত্বেও, তরুণ প্যাটের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেন না স্টুবনার। বিদ্যুৎবেগে এক পাশে সরে গেল প্যাট। এগিয়ে গিয়ে

আবার ঘুষি চালালেন স্টুবনার। এবার কিন্তু আর সরল না তরুণ যোদ্ধাটি, মুহূর্তের মধ্যে একপা এগিয়ে এসে শরীরের চকিত মোচড়ে ঘুষির মুখে পেতে দিল নিজের বাম নিতম্বটা। স্রেফ ইঞ্চি খানেকের মামলা, তবু, রুখে গেল স্টুবনারের কঠিন মুষ্টি। তারপর হাজার চেষ্টা করেও স্টুবনার ঐ নিতম্বে ছাড়া আর কোথাও আঘাত হানার সুযোগই পেলেন না।

বয়সকালে অনেক দুঁদে মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে লড়েছেন স্টুবনার, প্রদর্শনী লড়াইতে কোনদিন কারুর কাছে হারও মানেন নি। কিন্তু এখানে জেতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তরুণ প্যাট যেন ছেলেখেলা করছে তাঁর সঙ্গে। ঘুষি মারছে আলতো করে, অনিচ্ছায়, তাঁর আঘাত রুখছে চরম দক্ষতায়। স্টুবনারের উপস্থিতিটাকেই যেন গ্রাহ্য করছে না ও। লড়াইতে যেন মন নেই, স্বপ্নালু চোখ মাঝেমাঝেই বাইরে, যেখানে ছড়িয়ে আছে নিসর্গ। ঠিক এইখানেই আর একটা ভুল করে বসলেন স্টুবনার। ভাবলেন, ওর এই দূরমনা ভাবটা আসলে বৃদ্ধ প্যাটের শেখানো কোন কৌশল। অতর্কিতে কাছ থেকে ঘুষি চালানোর চেষ্টা করলেন। তারপর মুহূর্তের মধ্যে অনুভব করলেন—তাঁর হাতটাকে পুরোপুরি আটকে ফেলেছে তরুণ যোদ্ধাটি আর তাঁব দু'কানে প্রচণ্ড যন্ত্রণা।

'অ্যায়, বুঝলে, এই যে ঠিক সময় মতোন ঘুষি আসছে কিনা বুঝতে পারা', বৃদ্ধ খুশিতে ফেটে পড়েন, 'এটা কিন্তু কোন শেখানো কায়দা নয়। এ-সব ও আগে ভাগেই বুঝতে পারে। এই এক কলম লিখে দিলুম তোমাকে, ও একটা যাদুকর। তোমার দিকে না তাকিয়েও ও বুঝতে পারে তুমি ঘুষি চালাতে যাচ্ছো কি না, ঠিক কখন ঘুষিটা তুলছো, কত জোরে মারতে যাচ্ছো, কোথায় মারবে —স-ব। এ-সব কিন্তু আমি শেখাইনি ওকে। একে বলে প্রেরণা। এ হচ্ছে ওর সহজাত গুণ, বুঝলে।'

একবার, কিছুটা বেআইনী ভাবেই, প্যাট গ্লেগুনের মুখে একটা ঘুষি কষালেন স্টুবনার। পরের মুহূর্তেই তাঁর মুখে এসে পড়ল প্রতিপক্ষের ঘুষির ছোঁয়া। এমন কিছু জোরে হাত চালায়নি প্যাট, কিন্তু শুধু ঐ ধাক্কাতেই স্টুবনারের মাথাটা হেলে পড়ল পিছনদিকে, মট করে একটা আওয়াজ শোনা গেল, আর স্টুবনারের মনে হল—ঘাড়টা গেছে! শিথিল হয়ে এল তাঁর, শরীরটা ঝুলে পড়ল হাত দুটো। অর্থাৎ, খেল্ খতম। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন স্টুবনার, টলতে টলতে বসে পড়লেন কোনক্রমে।

'হ্যাঁ, ও পারবে'—স্টুবনার হাঁফাচ্ছেন, চোখে তাঁর সসম্ভ্রম দৃষ্টি।

বৃদ্ধের চোখ-ভরা গর্ব আর জয়োচ্ছ্বাস, 'তা, কোন চ্যাংড়া যোদ্ধা ওর সঙ্গে লাগতে এলে, ও কী করবে বলে মনে হয়?'

'ও তাদেরকে মেরেই ফেলবে নির্ঘাৎ'—স্টুবনারের রায়।

'না, ওর মাথা অত গরম নয়! ও স্রেফ কয়েকটা চ্যাংড়াকে ঠেঙিয়ে থেঁতো করে দেবে, ব্যস।'

ম্যানেজার কাজের কথায় এলেন, 'আচ্ছা, এখন তাহলে চুক্তিপত্রটা করে ফেলা যাক।'

'আরে রও রও, এখনও তো ওর সম্বন্ধে সবটা জানা হয়নি তোমার', বৃদ্ধ গ্রেগুন জানালেন, 'এক কাজ করো। ওর সঙ্গে পাহাড়ে চলে যাও হরিণ শিকার করতে। ওখানে গেলে ওর কল্‌জে আর ঠ্যাঙের জোরটা টের পাবে। তারপর না হয় চুক্তি-টুক্তি বানানো যাবে, কী বলো?'

পাহাড়ে পুরো দুটো দিন কাটিয়ে দিলেন স্টুবনার। আর তখনই বুঝলেন—হ্যাঁ, বৃদ্ধের কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ক্লান্ত শরীরে, মাথা নিচু করে পাহাড় থেকে ফিরলেন তিনি। তরুণ প্যাটের সরলতা বিস্মিত করেছে হাজারঘাটের-জল-খাওয়া স্টুবনারকে। তবে, সেই সঙ্গেই তিনি বুঝেছেন, এ ছেলে বোকা নয় মোটেই। অনাঘ্রাত ফুলের মত নিষ্পাপ মন, কিছু পাহাড়ী অভিজ্ঞতা ছাড়া দুনিয়া সম্বন্ধে একেবারেই আন্‌পড়, অথচ সাধারণ ছেলেদের থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ। সব মিলিয়ে তরুণ প্যাটকে বড় রহস্যময় মনে হয়েছে স্যাম স্টুবনারের' কী করে যে ছেলেটা সবসময় নিজের মেজাজকে একই তারে বেঁধে রাখে, বুঝে উঠতে পারেননি তিনি। কোন কিছুতেই যেন ওর দুশ্চিন্তা নেই উদ্বেগ নেই। সর্বদা ধীর-স্থির। একবারও ওকে কোন দিব্যি উচ্চারণ করতে শোনেন নি স্টুবনার, কোন সাদামাটা দিব্যিও নয়।

প্রশ্নটা তিনি রেখেও ছিলেন। তরুণ প্যাট উত্তর দিয়েছিল, 'দরকার পড়লে নিশ্চয়ই করতুম। তবে সে-রকম দরকার কোনদিন হবে বলে মনে হয় না। যদি কখনো হয়, তাহলে হয়ত আমিও দিব্যি গালব।'

বৃদ্ধ প্যাট গ্রেগুন এই জঙ্গলে ঘেরা গ্রামে একা একা থাকার সিদ্ধান্তে অবিচল। নিজের কুটিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে, ছেলেকে বিদায় জানালেন বৃদ্ধ।

'দেখে নিস প্যাট, আমি বলছি, কিছুদিনের মধ্যেই তোকে নিয়ে লেখালিখি হবে খবরের কাগজে। আমিও পড়ব সে-সব লেখা, দেখব তোর নাম। মন খারাপ

করিস না, তোর সঙ্গে যেতে পারলে খুব ভালো লাগত, কিন্তু আমার শেষের জমি যে এই পাহাড়েই কেনা আছে রে!'

ছেলেকে বিদায় জানিয়ে, স্টুবনারকে এক ধারে টেনে নিয়ে গেলেন বৃদ্ধ, তারপর ঝড়ের মতো বলে গেলেন :

'আমি তোমাকে বারবার যা বলে দিয়েছি, সেগুলো মনে রেখো। ছেলেটা একেবারে শাদা কাগজ, সৎ। বক্সিং-এর সঙ্গে যেসব নোংরামি জড়িয়ে থাকে, তার কিছুই ওর জানা নেই। ও-সব কথা ওকে আমি কক্ষনো জানাই নি। জাল-জোচ্চুরি সম্বন্ধে ও একেবারেই অজ্ঞ। ও শুধু জানে লড়াই-এর জন্যে কাকে বলে বুকের পাটা, জানে এর রোমাঞ্চ ও গৌরবের দিকটা। আমি ওকে শুনিয়েছি পুরনো আমলের বড় বড় বক্সারদের গল্প, আর তাদের সে-সব গল্পই ওর বুকে আগুন জ্বেলে দিয়েছে। স্যাম, তোমার কাছে সত্যি কথা বলছি, খবরের কাগজের বক্সিং-এর কলামগুলো আমি কেটে সরিয়ে রাখতুম, যাতে ওর চোখে না পড়ে। ও ভাবত আমি বুঝি ছবি ও খবর-জমানোর খাতায় সেঁটে রাখার জন্যেই ওগুলো কেটে নিই। কোন বক্সার রিঙে উঠে কখনও ইচ্ছে করে হেরেছে কিম্বা লড়াই ছেড়ে দিয়েছে—এমন কথা ও জীবনেও শোনেনি। কাজেই, স্যাম, আমার অনুরোধ, ওকে কোনদিন কোন সাজানো লড়াইতে জড়িয়ো না, ওর জীবনের সবকিছু এলোমেলো করে দিয়ো না। আর তেমন যদি কখনও ঘটে, তাহলে সব চুক্তি বাতিল, জেনে রেখো। ওকে কোনরকম সাজানো লড়াইতে নামানো মাত্রই চুক্তি ভেঙে যাবে, এই আমার শেষ কথা। আগে থেকে ষড় করে বাবাজী লড়ে কোন ঝুটো ভাগাভাগি করা চলবে না, সিনেমার লোকেদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে, আড়াল থেকে ওর ছবি তুলতে দেওয়া চলবে না। তোমাদের দুজনের হাতে এমনিতেই অঢেল টাকা আসবে, আসতেই হবে। কিন্তু সবরকমের জাল-জোচ্চুরি বন্ধ, নাহলে তুমি সব হারাবে। বুঝেছো?'

ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল তরুণ প্যাট, লাগাম টেনে ধরে কান পেতে শুনে নিল বৃদ্ধ পিতার শেষ উপদেশ, 'যা-ই করিস না কেন প্যাট, মেয়েদের ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার থাকিস। সব সময় মনে রাখিস—পুরুষদের সর্বনাশ করে মেয়েরাই। কিন্তু কখনও যদি সে-রকম কোন মেয়ের দেখা পাস, কোন সাচ্চা মেয়ের, তাহলে তাকে ছাড়িসনি। যশ, গৌরব, অর্থ—সবকিছুর থেকে দামী সে মেয়ে। কিন্তু প্রথমে তার ব্যাপারে তোকে নিশ্চিত হতে হবে। যখন জানবি সে সত্যিই খাঁটি, আঁকড়ে ধরবি তাকে, জড়িয়ে ধরবি তোর ঐ

শক্তপোক্ত হাত দুটো দিয়ে, এতটুকুও আলগা করবি না বাঁধন। সারা দুনিয়াটা যদি ভেঙে খান্-খান্ও হয়ে যায়, টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তাহলেও না, কিছুতেই হারানো চলবে না তাকে, সেই মেয়েকে। জেনে রাখিস প্যাট, একটা ভালো হচ্ছে আসলে···আসলে একটা ভালো মেয়েই। মনে রাখবি, এটাই প্রথম কথা, আর এটাই শেষ কথা!

সান ফ্রান্সিসকোয় পৌঁছনোর পর থেকেই সমস্যায় পড়ে গেলেন স্যাম স্টুবনার। না, তরুণ প্যাট একেবারেই বদমেজাজী নয়, কিম্বা ওর বাবার আশঙ্কামতো শহরের সব কিছুতেই খুব যে অসন্তোষ বোধ করছে, তা-ও নয়। ওর রীত্-নীত্ বরং একেবারে বিপরীত—বেশ মিষ্টি, আচার-ব্যবহার অতি ভদ্র। সমস্যাটা অন্য জায়গায়। নিজের সেই ভালোবাসার পাহাড়-ঘেরা বাড়ির জন্যে মন-কেমন করছে ওর। তাছাড়া, শহরের এই জনাকীর্ণ পরিবেশ দেখে মনে মনে কিছুটা ঘাবড়েও গেছে ও, যদিও বাইরে তা প্রকাশ করতে চায় না। যে-কোন রেড ইণ্ডিয়ানের মতো ডোণ্ট কেয়ার ভঙ্গীতে শহরের জনাকীর্ণ রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় ও।

সাতটা দিন কাটতে না-কাটতেই মুখ খুলল ও, 'আমি এখানে লড়তে এসেছি। কোথায় জিম হ্যান্‌ফোর্ড?

শিস দিয়ে উঠলেন স্টুবনার, 'আরে অত বড় একজন চ্যাম্পিয়ন এখন তোমাকে পাত্তাই দেবে না। স্রেফ বলে দেবে—যাও হে, আগে একটু নাম-টাম করো, তারপর এসো আমার সঙ্গে লড়তে। বুঝলে?'

'আমি কিন্তু ওকে পিটিয়ে ছাতু করে দিতে পারি।'

'সে কথা আমি না-হয় বুঝলুম, কিন্তু লোকে তা মানবে কেন? জিম হ্যান্‌ফোর্ডকে পিটিয়ে ছাতু বানাতে পারলে তুমি বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে। কিন্তু জীবনের প্রথম লড়াইতে নেমেই কেউ আজ পর্যন্ত বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হতে পারে নি!'

'আমি কিন্তু পারব।'

'কিন্তু লোকে তো তোমার কথা মানবে না প্যাট। তারা তোমার লড়াই দেখতে আসবেই না। আর জানো তো, দর্শকরাই হচ্ছে নগদ আমদানীর উৎস। ঠিক এই কারণেই জিম হ্যান্‌ফোর্ড তোমার কথা কানেও তুলবে না। তোমার সঙ্গে লড়তে নামলে ওর কোন ফয়দাই হবে না। তাছাড়া, এক ক্রীড়া-সংস্থার সঙ্গে পঁচিশ সপ্তাহের একটা চুক্তি হয়েছে ওর। সপ্তাহে তিন হাজার ডলার করে পাচ্ছে ও। তুমি কি মনে কর একটা অখ্যাত বক্সারের সঙ্গে লড়তে গিয়ে

ঐ চুক্তি ভাঙবে ও! শোনো, প্রথমে তোমাকে একটা দারুণ কিছু দেখাতে হবে, একটু নাম-টাম করতে হবে। স্থানীয় ক্লাবগুলোর জনাকয়েক সাদামাটা বক্সারের সঙ্গে প্রথমে লড়ে নিতে হবে। এই যেমন ধরো গোলগাল কলিন্স, মারকুটে কেলী, উড়ন্ত ডারম্যান—এদের সঙ্গে আর কি! এদেরকে হারাতে পারলে জানবে মইয়ের প্রথম ধাপটাতে পা রাখতে পেরেছো। তারপর আর ভাবনা নেই, তরতর করে এগোতে থাকবে।'

নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল প্যাট, 'যে তিনজনের নাম করলেন, ওদের সঙ্গে একই দিনে পরপর লড়ব আমি। আপনি ব্যবস্থা করে ফেলুন।'

ওর কথা শুনে হেসে উঠলেন স্টুবনার।

প্যাট শুধোল, 'হাসছেন কেন? পারব না ভাবছেন?'

ও-রকমভাবে লড়ায়ের বন্দোবস্ত করা যাবে না। এক এক বারে এক জনের সঙ্গে লড়তে হবে তোমাকে। তাছাড়া মনে রেখো, এ খেলার অন্ধিসন্ধি আমার জানা আছে, আর আমিই তোমার ম্যানেজার। হিসেব কষে পা বাড়াতে হবে, আর সে হিসেবটা আমার ঠোঁটস্থ। বরাত যদি মন্দ না হয়, তাহলে বছর দুয়েকের মধ্যেই চূড়ায় পৌঁছে যাবে তুমি. সারা দুনিয়ার চ্যাম্পিয়ন হয়ে অর্থের ফোয়ারায় বসে থাকবে গা ডুবিয়ে।'

ঝলমলে ভবিষ্যতের কথা ভেবে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্যাট, তারপর হঠাৎ ওর মুখে ফুটে উঠল খুশির আভা।

'তারপর তো আমি এ-সব লড়াই-টড়াই ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বাবার কাছে ফিরে যেতে পারব, তাই না?'

কিছু একটা উত্তর দিতে গিয়েও নিজেকে সংযত করে নিলেন স্টুবনার। এই তরুণ যোদ্ধাটি একটু বিচিত্র, সন্দেহ নেই। কিন্তু একবার চূড়ায় উঠে যাওয়ার পর অন্যান্য চ্যাম্পিয়নদের মতোই যে হয়ে উঠবে ও—এবিষয়ে স্টুবনার নিঃসন্দেহ। তাছাড়া, দু'বছর সময়টা তো নেহাত কম নয়। অনেক কিছুই ঘটে যাবে এই দুটো বছরে।

নিজের বাসায় চুপচাপ দিন কাটে প্যাটের। লাইব্রেরী থেকে আনানো রাশি রাশি কবিতার বই আর উপন্যাসের মধ্যেই সারাটা দিন ডুবে থাকে ও। দেখে-শুনে স্টুবনার ওকে পাঠিয়ে দিলেন উপসাগরের একটা অঞ্চলে। ওকে চোখে চোখে রাখার ভার রইল স্পাইডার ওয়ালশ্-এর ওপর। দিন সাতেক পরেই বার্তা পাঠাল স্পাইডার—দিব্যি আছে প্যাট। ভোর থেকে

শুরু করে সাঁঝ অবধি সে ঘুরে বেড়ায় পাহাড়ে পাহাড়ে, নদীর জল তোলপাড় করে বেড়ায় ট্রাউট মাছের সন্ধানে, শিকার করে খরগোশ আর তিতির পাখি। একটা মদ্দা হরিণ নাকি প্রায় দশ বছর ধরে সমস্ত শিকারীকে বোকা বানিয়ে দিব্যি চরে বেড়াচ্ছে ঐ অঞ্চলে। সেটার পিছু পিছু ঘুরছে প্যাট। বসে থেকে থেকে স্পাইডারই অলস হয়ে পড়ছে, মুটিয়ে যাচ্ছে, আর দিব্যি তরতাজা হয়ে চর্কিপাক খাচ্ছে তার হেফাজতে থাকা অদ্ভুত তরুণটি।

বিভিন্ন ক্লাবের ম্যানেজারদের সঙ্গে দেখা করলেন স্টুবনার। যা ভেবেছিলেন তা-ই। তাঁর মুখে কোন্ এক আন্‌পড় মুষ্টিযোদ্ধার কথা শুনে নানান টীকা-টিপ্পনী কাটলেন ম্যানেজাররা। আরে বাবা, ও-রকম অনেক আনাড়িই তো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার খোয়াব দেখে। তবে, একেবারে মামুলী ধরণের, ধরা যাক একটা চার রাউণ্ডের লড়াই—হ্যাঁ, সে-রকম একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাই বলে আসল লড়াই? না, অসম্ভব। কিন্তু স্টুবনারও নাছোড়বান্দা, সত্যিকারের লড়াই দিয়েই মুষ্টিযুদ্ধের দুনিয়ার পা রাখবে প্যাট। নিজের যাবতীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি মান-মর্যাদা খাটিয়ে শেষ পর্যন্ত সে ব্যবস্থা পাকাও করে ফেললে তিনি। বিস্তর টালবাহানা করে অবশেষে মিশন ক্লাব রাজি হল—মারকুটে কেলীর সঙ্গে পনেরো রাউণ্ডের লড়াইয়ে নামতে পারবে প্যাট গ্লেণ্ডন, যার পুরস্কার-মূল্য হবে এক হাজার ডলার। সাধারণত তরুণ যোদ্ধারা লড়তে নামার সময় পুরনো আমলের কোন দুঁদে মুষ্টিযোদ্ধার নামেই নিজেদের পরিচয় দিত। কাজেই, এই প্যাট যে সেই সুবিখ্যাত প্যাট গ্লেণ্ডনেরই ছেলে, এমন সম্ভাবনার কথা কারুর মাথাতেই আসে নি। স্টুবনারেরও মুখে কুলুপ। ভবিষ্যতের জন্য একটা চমক জমা রইল তাঁর জিম্মায়।

একমাস পর। আজ প্যাটের প্রথম লড়াই। স্টুবনার উদ্বিগ্ন। দারুণ কিছুর আশায় নিজের মান-মর্যাদা বাজি রেখেছেন তিনি। মিনিট পাঁচেক হল রিং-এ নিজের কোণে গিয়ে বসেছে প্যাট! ওর দিকে তাকিয়ে বিস্ময় ফুটে উঠলো স্টুবনারের চোখে—প্যাটের মুখের স্বাভাবিক লাবণ্যটা নেই, কেমন যেন ফ্যাকাশে লাগছে মুখটা!

ওর কাঁধে আস্তে আস্তে চাপড় মারলেন স্টুবনার, 'একদম ঘাবড়িও না, প্যাট। রিং-এ প্রথমবার নামার সময় সবারই একটু অস্বস্তি হয়। আর কেলী সবসময় প্রতিপক্ষকে কিছুক্ষণ রিং-এ বসিয়ে রেখে তারপর আসে। এক ধরণের মানসিক চাপ সৃষ্টির কায়দা আর কি।

'ওসব কিছু নয়', প্যাটের উত্তর, 'চারপাশে তামাকের গন্ধ। এই গন্ধটাতে আমি ঠিক অভ্যস্ত নই। ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে।'

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল স্টুবনারের। মানসিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়লে স্বয়ং স্যামসনের পক্ষেও কোন প্রতিযোগিতামূলক লড়াইয়ে জেতা সম্ভব নয়। তামাকের গন্ধ? আস্তে আস্তে ওটা সয়ে যাবে প্যাটের।

প্যাট যখন রিং-এ ঢোকে, একটাও উল্লাসধ্বনি শোনা গেল না। কিন্তু যখন দড়ির নিচ দিয়ে রিং-এ এসে দাঁড়াল মারকুটে কেলী, উল্লাসে ফেটে পড়ল দর্শকরা। মারকুটে কেলী নাম আর চেহারার মিলটা দেখার মতো। ভয়ংকর দর্শন চেহারা, কালো রোমশ শরীর, ফুলে-ওঠা পেশীর পাহাড। পুরো দুশো পাউণ্ড ওজন। কৌতূহলী চোখে কেলীর দিকে তাকাল প্যাট। প্রত্যুত্তরে চোখে হিংস্র দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলল কেলী। দর্শকদের সঙ্গে দুজনকে পরিচিত করানো হল। পরস্পরের করমর্দন করল ওরা। প্যাটের দস্তানা-পরা হাতে হাত রেখে দাঁতে দাঁত ঘষলো কেলী, মুখের কুঞ্চনে ঝরে পড়ল তীব্র রোষ, আর চাপাগলায় বলল:

'এবার বাঁচা নিজেকে। আজ তোকে কাঁচা চিবিয়ে খাব রে ছোঁড়া!' বলতে বলতে এক ঝট্‌কায় নিজের হাত থেকে প্যাটের হাতটা সরিয়ে দিল কেলী।

দর্শকমণ্ডলী হাসিতে মুখর। জল্পনা শুরু হয়ে গেল— ঐ ছোকরাকে কী বলে থাকতে পারে মারকুটে কেলী।

নিজের কোণে ফিরে, ঘণ্টা পড়ার জন্য অপেক্ষা করতে করতে স্টুবনারের দিকে তাকাল প্যাট, 'আচ্ছা, ও আমার উপর অত রেগে আছে কেন?'

'এতটুকুও রেগে নেই। আসলে তোমাকে ভয় দেখাতে চাইছে। কায়দা, বুঝলে না! হাত ছাড়া মুখটাও চালানো আর কি।'

'এটা বক্সিং নয়'—প্যাটের মন্তব্য। চকিতে চোখ তুললেন স্টুবনার। না, তরুণটির চোখে টলটল করছে তার স্বাভাবিক নীলচে আভাটাই।

প্রথম রাউণ্ড শুরু হওয়ার ঘণ্টা পড়ল। উঠে দাঁড়াল প্যাট। ম্যানেজার হুঁশিয়ার করে দিলেন, 'সাবধান। ও কিন্তু একেবারে মানুষখেকোর মতো ধেয়ে আসবে তোমার দিকে।'

তা-ই এল বটে মারকুটে কেলী। ভয়ংকর আক্রোশে ধেয়ে এল মানুষখেকোর মতো। হালকা পায়ে দু' এক পা এগিয়েছিল প্যাট। প্রতিপক্ষের মতলবটা আঁচ করে একটু সরে গেল চকিতে, ডান হাতটা ওপরে উঠল ধনুকের ছিলার মত টানটান হয়ে, বাঁপায়ের বুড়ো আঙুলের উপরে শরীরের ভারসাম্য রেখে সমস্ত

ওজনটা ডানহাতে নিয়ে এলো প্যাট, তারপর সেই বজ্রমুষ্টি প্রচণ্ড গতিতে নেমে এলে কেলীর চোয়ালে। অতঃপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল প্যাট, দু'চোখে কৌতূহল। লড়াই শেষ। আহত ষাঁড়ের মতো মেঝেয় আছড়ে পড়েছে কেলী, নিথর, নিশ্চল। ঝুঁকে পড়ে দশ পর্যন্ত গুনলেন রেফারি, কেলীর কানে একটা শব্দও পৌছলো না। কেলীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে এল ওর সহকারীরা, কিন্তু তাদের আগেই এগিয়ে গেল প্যাট। নিথর হয়ে পড়ে থাকা বিশাল শরীরটাকে ও তুলে নিল দু'হাতে, বয়ে নিয়ে গেল কেলীর নির্দিষ্ট কোণে, তারপর চৌকির ওপর শুইয়ে ওর সহকারীদের হাতে ছেড়ে দিল।

আধমিনিট পর মাথা তুলল মারকুটে কেলী, কেঁপে উঠল চোখের পাতা। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে, ফ্যাঁসফেসে গলায় একজন সহকারীকে শুধোল ও, কী হয়েছিল বলো তো? আমার মাথায় কি ছাদটা ভেঙে পড়েছিল?

দর্শকরা বলাবলি করল—নেহাতই ফাঁক তালে মারকুটে কেলীকে হারিয়ে দিয়েছে প্যাট গ্রেগুন। তবে এই জয়ের ফলে একটা কাজ হল। রুফ্ ম্যাসন এর সঙ্গে লড়ার ডাক পেল প্যাট। ঠিক তিন সপ্তাহ পরে অনুষ্ঠিত হল এই লড়াই। লড়াইটাতে কী যে হল, তা বুঝে ওঠারও সময় পেল না ড্রিমল্যাণ্ড রিং-এর চারধারে বসা নিয়েরা ক্লাবের দর্শকরা। রুফ্ ম্যাসন হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা, ধূর্ততার জন্য বিখ্যাত। প্রথম রাউণ্ড শুরু হওয়ার ঘণ্টা বেজে ওঠা মাত্রই ওরা দুজন এগিয়ে গেল রিং-এর মাঝখানে। না, কেউই কারুর দিকে ধেয়ে যায় নি, কেউ কাউকে এগিয়ে আঘাতও করেনি। দুজনে চুপচাপ মেপে যাচ্ছিল দুজনকে। দুজনেরই বাহু নিচের দিকে, আর দু'জোড়া দস্তানা খুব কাছাকাছি প্রায় পরস্পরকে ছুঁয়ে ফেলা যাচ্ছিল। সেকেণ্ড পাঁচেক এভাবেই দাঁড়িয়ে রইল দুই প্রতিপক্ষ। তারপরই ঘটে গেল ঘটনাটা। ঘটল এত দ্রুত যে উপস্থিত প্রায় শ'খানেক দর্শকের মধ্যে একজনও ব্যাপারটা বুঝে ওঠার সময় পেল না। ডান হাতটা তুলে ঘুষি চালানোর ভান করল রুফ্ ম্যাসন। আসল ঘুষি চালানোর আগে স্রেফ একটা মহড়া (চালু ভাষায় চুক্কি) আর কি। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘুসি চালাল প্যাট। ওরা দুজন তখন পরস্পরের খুবই কাছাকাছি ছিল, ফলে বড়জোর আটইঞ্চি দূর থেকে ঘুষিটা চালাতে পেরেছিল প্যাট। বাঁ হাতি ঘুষি, তার পিছনে কাঁধের একটু তীক্ষ্ণ মোচড়। শরীরের সমস্ত ওজনের সাথে প্রচণ্ড গতি মিশে বিদ্যুৎ বেগে প্যাটের ভয়ঙ্কর ঘুষিটা গিয়ে পড়ল রুফ্ ম্যাসনের থুতনীতে।

বিমূঢ় দর্শকরা শুধু দেখল—হাঁটু ভেঙে দুবার টাল খেয়ে লুটিয়ে পড়ছে রুফ্ ম্যাসন! তবে ঘটনাটা রেফারির চোখ এড়ায় নি। ঝটপট এগিয়ে গিয়ে দশ পর্যন্ত গুনে ফেললেন তিনি। এবারেও প্যাট তার প্রতিদ্বন্দ্বী বয়ে নিয়ে গেল রিং-এর কোণে। মিনিট দশেক পরে সহকারীদের সাহায্যে উঠে দাঁড়াল ম্যাসন। দোমড়ানো হাঁটু, টলমলে পা, ঘোলাটে চোখ। কথা-হারা বিস্মিত দর্শকদের সারির মধ্যে দিয়ে সাজঘরে গিয়ে ঢুকল ও।

এক সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রুফ্ ম্যাসন জানাল, মাথায় ছাদ ভেঙে পড়েছিল ভেবে মারকুটে কেলী কিছু ভুল করে নি।

গোলগাল কলিন্সের সঙ্গে পনেরো রাউণ্ডের লড়াইএর নিষ্পত্তি ঘটল প্রথম রাউণ্ডের ঠিক বারো সেকেণ্ডের মাথায়। এবার মুখ খুলতে বাধ্য হলেন স্টুবনার।

'সবাই এখন তোমাকে কী নামে ডাকে জানো?'

মাথা নাড়ল প্যাট—জানে না।

'এক ঘুষির শ্রেণ্ডন।'

সামান্য হাসির রেখা ফুটেউ ঠলো প্যাটের ঠোঁটে। কে ওকে কী নামে ডাকছে না ডাকছে, তা নিয়ে ওর কোন মাথাব্যথা নেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানকার সব কাজ মিটিয়ে ওকে ফিরে যেতে হবে সেই অরণ্য ছোঁয়া নির্জন পাহাড়ী বাস-ভূমিতে।সেই কাজটুকু ও যত তাড়াতাড়ী সম্ভব চুপচাপ করে যাচ্ছে শুধু, ব্যস।

'না না, এ চলতে পারে না', বলতে বলতে মাথা নাড়লেন ম্যানেজার, 'অত তাড়াতাড়ি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা উচিত নয়। ওদেরকে আরও কিছুটা সময় দিতে হবে।'

বিস্ময় গোপন থাকে না প্যাটের গলায়, 'কিন্তু আমি তো এখানে লড়তেই এসেছি!'

আবার মাথা নাড়লেন স্টুবনার, 'ব্যাপারটা একটু বুঝতে চেষ্টা করো প্যাট। বক্সিং-এর জগতে খুব বড়, খুব উদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে তোমাকে। অন্য লড়িয়েদের এতটা ঘাবড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। আব দর্শকদের প্রতিও অত্যন্ত অবিচার করছো তুমি। ওরা গাঁটের অর্থ খরচ করে লড়াই দেখতে আসে, সে অর্থ টা উশুল হওয়া চাই তো, নাকি বলো? তাছাড়া, এভাবে চললে আর কেউ তোমার সঙ্গে লড়তেই চাইবে না, ভয়েই পিঠটান দেবে। আর ঐ দশ সেকেণ্ডের লড়াই দেখার জন্যে এবার থেকে দর্শকরাও আর আসবে না। আচ্ছা, তুমিই বলো না, দশ সেকেণ্ডের কোন লড়াই দেখার জন্যে কি তুমি এক

ডলার বা পাঁচ ডলার খরচ করবে?'

ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হল না প্যাটের। কথা দিল, এবার থেকে দর্শকদের অর্থ উশুল হওয়ার দিকে নজর দেবে ও। আর সেইসঙ্গেই জানাল, ব্যক্তিগতভাবে ও কোন একশ রাউণ্ডের মুষ্টিযুদ্ধ দেখে সময় নষ্ট করার বদলে সেই সময়টুকু মাছ ধীরে কাটাতে পারলেই খুশি হবে ও।

কিন্তু তখনও পর্যন্ত মুষ্টিযুদ্ধের জগতে কোন কদর পায় নি প্যাট গ্রেগুন! স্থানীয় দর্শকরা ওর নাম শুনলে হাসাহাসি করে। প্যাট গ্রেগুন মানেই কিছু মজাদার লড়াই, আর ছাদ ভেঙে পড়া সম্বন্ধে মারকুটে কেলীর সেই মন্তব্য। প্যাট গ্রেগুন কেমন লড়ে, কিভাবে লড়ে—কেউ জানে না! কতখানি দম ওর? কতটা পরিশ্রম করতে পারে? শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কঠিন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মতো কোন ক্ষমতা কি ওর আছে? এখনও পর্যন্ত ও শুধু ফাঁকতালে মাত্র একখানা করে লাগ্-না-লাগ্ গদাম্ ঘুষি চালিয়েছে, আর বরাত জোরে জিতে গেছে! ব্যস, এটুকুই।

প্যাটের চতুর্থ লড়াই পিট সোসো-র সঙ্গে। পিট সোসো বুচারটাউনের বাসিন্দা, আদতে পর্তুগীজ। রিং-এর মধ্যে হরেক কিসিমের কায়দাবাজির জন্যই বিখ্যাত এই মুষ্টিযোদ্ধাটি। ওর সঙ্গে লড়াইয়ের আগে কোন রকম অনুশীলন করার সুযোগ পায়নি প্যাট। কাউকে না জানিয়ে, বুক-ভরা দুঃখ নিয়ে ও চলে গিয়েছিল ওদের সেই পাহাড়-ছোঁয়া কুটিরে। সেখানে গিয়ে ও সমাধি দিয়ে এসেছে ওর বাবাকে। বৃদ্ধের হৃদ্যন্ত্রের অবস্থা ভালো ছিল না। হঠাৎই সেটা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।

সানফ্রান্সিসকোয় যখন ফিরল প্যাট, লড়াইয়ের সময় তখন প্রায় উত্তীর্ণ। এতটুকুও সময় পেল না ও, পোশাক খুলে লড়াইয়ের পোশাক পরে নিতে হল চটপট। নির্ধারিত সময়ের পর তখন দশ মিনিট অতিক্রান্ত।

দড়ির নিচ দিয়ে গলে যখন রিং-এ ঢুকছে ও, স্টুবনার তখন হুঁশিয়ারি দিলেন, 'ওকে একটু সুযোগ দিতে হবে, মনে রেখো। ওকে নিয়ে একটু খেলা করে যাও, তবে সাবধান, কেউ যেন বুঝতে না পারে। দশ-বার রাউণ্ড টেনে যাও, তারপর শুইয়ে দিও ওকে।'

ম্যানেজারের নির্দেশ অমান্য করল না প্যাট। সোসোকে শুইয়ে দেওয়াটা কোন ব্যাপার ছিল না, কিন্তু সে চেষ্টা করছিল না ও। বরং ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল নিজেকে বাঁচাতে। দেখার মতো লড়াই! দর্শককুল রোমাঞ্চিত, উল্লসিত।

ঘূর্ণিঝড়ের মতো আক্রমণ হানছে সোসো, সুকৌশলী কায়দা দেখাচ্ছে, পিছু হঠছে, আবার ধেয়ে আসছে। নিজেকে বাঁচানোর জন্য সবটুকু অভিজ্ঞতা ঢেলে দিতে হচ্ছে প্যাটকে। তবুও অক্ষত থাকতে পারছে না ও।

বিশ্রামের মুহূর্তগুলোয় উৎসাহ দিচ্ছিলেন স্টুবনার—বাহ, এই তো চাই। সবই ঠিকঠাক চলছিল। গণ্ডগোলটা ঘটে গেল চতুর্থ রাউণ্ডেই। চমৎকার একটা কায়দা দেখাল সোসো। জব্বর হাততালী পড়ল। তালগোলের মধ্যে সোসোর চোয়ালে একটা হুক চালাল প্যাট। তারপর সবিস্ময়ে দেখল—প্রতিপক্ষের হাত দুটো ঝুলে পড়ছে নিচের দিকে, চোখ ঘোলাটে, থরথর করে কাঁপছে পা দুটো, দুমড়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে পড়ে যাচ্ছে শরীরটা। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না প্যাট। নক-আউট করার মতো জোরে তো ঘুষি চালায় নি ও! অথচ, প্রতিপক্ষ লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছে। নিজের হাত দুটো নামিয়ে, কৌতূহলী চোখে প্রতিপক্ষকে দেখতে লাগল ও। সোসো টলছে, প্রায় পড়ো-পড়ো। তারপর হঠাৎই, এক লহমায়, উঠে দাঁড়ানর চেষ্ট করল ও. বাঁকা শরীর নিয়ে টলমলে পায়েই এগিয়ে এল বন্য পশুর মতো।

জীবনে এই প্রথম আর শেষবার, নিজের প্রতিরক্ষায় গাফিলতি ঘটল প্যাটের। একটু করে দাঁড়িয়ে টলমলে মানুষটাকে চলে যাওয়ার পথ করে দিচ্ছিল ও। টলতে টলতেই, ডানহাতে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি চালাল সোসো। ঘুষিটা সপাটে গিয়ে পড়ল প্যাটের চোয়ালে। সবকটা দাঁত যেন নড়ে উঠল ওর। উল্লাসে চিৎকার করে উঠল দর্শকরা। কিন্তু সে উল্লাসধ্বনি প্যাটের কানে পৌঁছলো না। ওর চোখের সামনে এখন শুধু সোসোর মুখ, বিদ্রূপ আর অবজ্ঞা ভরা চ্যালেঞ্জ নেই মুখে, যন্ত্রণার কোন চিহ্ন নেই। সোসোর ঘুষিতে আহত হয়েছে প্যাট। কিন্তু সেই আঘাত ছাপিয়ে ওর শরীরে এখন জ্বলন্ত ক্রোধ। এ রকম হীন কায়দায় আঘাত করল লোকটা? সদ্য প্রয়াত পিতা যে-টুকু ক্রোধ সঞ্চারিত করে গেছেন ওর শরীরে, তাঁর সবটুকু জ্বলে উঠল দপ্ করে। মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিল ও, যেন ঝেড়ে ফেলতে চাইল আঘাতটুকু। তারপর টানটান হয়ে দাঁড়াল। আর ঠিক তার পরের মুহূর্তের ঘটে গেল বিস্ফোরণ। একদিকে শরীর ঝোঁকাল প্যাট, আর পলক ফেলার আগেই সোসোর চোয়ালে গিয়ে পড়ল প্যাটের শরীরের সমস্ত জোরের সাথে প্রচণ্ড ক্রোধ মেশানো ডান হাতের বজ্র, বাঁ হাতটা টেনে আনল পেটের কাছে। তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়ল সোসো. ওর জ্ঞান ফেরানোর জন্য পাক্কা আধঘণ্টা খাটতে হল ক্লাবের চিকিৎসকদের।

তারপর মুখে এগারটা সেলাই দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে দেওয়া হল সোসোকে।

আমি অত্যন্ত দুঃখিত ম্যানেজারকে বলল প্যাট, আমি বোধহয় মেজাজটা ঠিক রাখতে পারি নি। কথা দিচ্ছি, আর কখনও এমন করব না। বাবা আমাকে এ সম্বন্ধে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছেন। বাবা বলতেন, মাথা গরম করার দরুণ জীবনে তাঁর প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ওভাবে যে ক্ষেপে যাব, আগে ভাবতেও পারি নি। এবার থেকে নিজেকে ঠিক সংযত রাখব, দেখে নেবেন।

আশ্বস্ত হলেন স্টুবনার। অবস্থাটা এখন এমন একটা জায়গায় এসেপৌছেছে, যেখানে এই তরুণ যোদ্ধার কোন কথাকেই আর অবিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি।

স্টুবনার বললেন, 'তোমার মাথা গরম করার দরকারটাই বা কী? যে-কোন সময়ে, যে-কোন অবস্থাতেই তো প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারো তুমি।'

'হ্যাঁ, লড়াইয়ের রিং-এর যে-কোন ইঙ্গিতে, যে-কোন মুহূর্তে'—প্যাটের ঘোষণা।

'আর যে-কোন মুহূর্তে তাদেরকে শুইয়ে দিতেই পারো।'

'আলবাৎ পারি। না, জাঁক করছি না। কিন্তু এ ক্ষমতাটা আমার মধ্যে আছেই। আমার চোখ শুধু ফাঁকটা দেখিয়ে দেয়, বাকিটুকু দক্ষতার কারুকাজ। সময় আর দূরত্বের ব্যাপারটা তো আমার কাছে জল-ভাত। বাবা বলতেন, এটা আমার প্রতিভা। তখন ভাবতুম, বাবা আমাকে ভোলাতেন। এখন এদের সঙ্গে লড়তে লড়তে বুঝছি, ঠিকই বলতেন তিনি। বাবা বলতেন, আমার মন আর পেশীগুলো এক সুতোয় বাঁধা।'

স্টুবনার যেন কিছুটা আনমনা। বললেন, 'হ্যাঁ, যে-কোন ইঙ্গিতে, যে-কোন মুহূর্তে।'

ঘাড় নাড়ল প্যাট। ওর কথা বিশ্বাস করতে এতটুকুও কষ্ট হল না স্টুবনারের। তাঁর চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে উঠল এক সোনারঙা ভবিষ্যতের চলচ্ছবি। এই এই ছবি দেখতে পেলে বৃদ্ধ প্যাট গ্লেণ্ডন হয়ত এখন উঠে আসতেন কবর ভেঙে।

'মনে রেখো দর্শকদের অর্থটা যেন উশুল হয়ে যায়, প্রতিটা লড়াইয়ের আগে আমরা দুজনে মিলে ঠিক করে নেব, লড়াইটা ক' রাউণ্ড পর্যন্ত গড়াবে। ভালো কথা, তোমার পরের লড়াই ঐ উড়ন্ত ডার্‌ম্যানের সঙ্গে। এক কাজ করা যাক। লড়াইটা পনের রাউণ্ড অবধি চলুক, আর ঐ পনের রাউণ্ডের মাথায় ওকে চিৎকরে দাও। এতে করে দর্শকরাও লড়াইটা উপভোগ করতে পারবে। ঠিক আছে? ঠিক আছে।'

'এটা তোমার পরীক্ষা, মনে রেখো, হুঁশিয়ার করে দিলেন স্টুবনার, শেষ রাউণ্ডে

ওকে হয়ত নক-আউট না-ও করতে পারো তুমি।'

'দেখাই যাক।' একটু থামল প্যাট, তারপর হাতে তুলে নিল লংফেলোরা রচনাবলীর একটা খণ্ড, 'যদি না পারি, তাহলে জীবনে আর কোনদিন কবিতা পড়ব না।'

খুশিতে উছলে উঠলেন ম্যানেজার, 'সাবাশ। অবশ্য ঐসব কবিতা-টবিতার মধ্যে কী যে তুমি পাও আমার মাথায় ঢোকে না।

প্যাটের শরীর চিরে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। কোন উত্তর দিল না ও। জীবনে একটি মাত্র মানুষকেই দেখেছে ও, যে কবিতা ভালবাসতো—সেই শিক্ষিক যাব মাথায় ছিল লালরঙা চুলের ঢেউ, যে মেয়ের ভয়ে ও পালিয়ে গিয়েছিল গভীর অরণ্যে !

'কোথায় চললে ?' স্টুবনারের গলায় স্পষ্ট বিস্ময়।

প্যাট তখন দরজায় হাত রেখেছে। ডাক শুনে পিছু ফিরল ও।

'একটু বিজ্ঞান আকাদেমীতে যাচ্ছি। ওখানে আজ রাতে একজন অধ্যাপক ব্রাউনিং সম্বন্ধে বলবেন। আর জানেন তো, ব্রাউনিং-এর কবিতা ছাড়া জীবনে এক পা-ও চলা যায় না। মাঝে-মাঝে ভাবি নাইট স্কুলে ভর্তি হয়ে যাই।'

ম্যানেজার আতঙ্কিত, 'কিন্তু, আজ রাতেই যে উড়ন্ত ডারম্যানের সঙ্গে লড়তে হবে তোমাকে '

'মনে আছে। কিন্তু সাড়ে নটা পৌনে দশটার আগে আমি রিং-এ ঢুকছি না বক্তৃতাটা শেষ হতে হতে সোয়া নটা বাজাবে। ইচ্ছে করলে ওখানে গিয়ে আমাকে গাড়িতে তুলে নিতে পারেন।'

অসহায় ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকালেন স্যাম স্টুবনার।

ঘাবড়াবেন না, অভয় দিল প্যাট। বাবা বলতেন যে-কোন লড়াইয়ের ঠিক আগের কয়েকটা ঘণ্টাই হচ্ছে মারাত্মক। ঐ সময়টাতে স্রেফ ভেবে ভেবে আর দুশ্চিন্তা করে করে অনেক যোদ্ধাই ভেঙে পড়ছে লড়াইয়ের সময়। তবে আমাকে নিয়ে আপনার ও সব ভাবার কোন দরকার নেই। এই যে আমি দিব্যি বক্তৃতা শুনতে যেতে পারছি, এতে আপনার খুশিই হওয়া উচিত।'

সেই রাতে, পনের রাউণ্ডের সেই চোখ-ঝলসানো লড়াই দেখতে দেখতে, বারবার ভাবছিলেন স্টুবনার—দর্শকরা যদি জানত এই তরুন মুষ্টিযোদ্ধাটি ব্রাউনিং সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা শুনে এসেই সরাসরি নেমে পড়েছে রিং-এ, তাহলে কী ভাবত তারা ?

উড়ন্ত ডার্‌ম্যানটি বয়সে তরুণ, জাতে সুইডিশ, ছেলেটি অসম্ভব লড়িয়ে, আশ্চর্য সহ্যশক্তি। কখনও থমকায় না, সারাক্ষনই আক্রমণই করে যায়, প্রতিটা রাউণ্ডেই উজাড় করে দেয় নিজেকে। একটু দূর থেকে লড়ার সময় ওর হাত দুটো লাঠির মতো ঘোরে, আর কাছ থেকে লড়ার সময় প্রতিপক্ষকে ঠেকিয়ে রাখে কাঁধ দিয়ে, অনেকটা কুস্তির মতো, আর সুযোগ পেলেই আঘাত হানে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘূর্নিঝড়ের মতো আছড়ে পড়ে ও, তাই ওকে উড়ন্ত নামেই ডাকা হয়। সময় আর দূরত্বের হিসেবে ভুল করার জন্যই হারতে হয় ওকে। তবু ও, আজ পর্যন্ত নেহাত কম লড়াইতে জেতে নি। ঐ লাগাতার ঘুষিবৃষ্টির মধ্যে এক-আধটাও ঠিকঠাক জায়গায় পড়লেই তো কেল্লা ফতে। প্যাটের ওপর নির্দেশ ছিল—প্রতিপক্ষকে প্রথমেই শুইয়ে দেওয়া চলবে না। ফলে, নিজেকে বাঁচাতেই ব্যস্ত ছিল ও। মারাত্মক আঘাতগুলো এড়িয়ে গেলেও, ঐ ভয়ঙ্কর দস্তানাজোড়ার সব আঘাত থেকে রেহাই পাচ্ছিলো না ও। চমৎকার একটা ট্রেনিং চলছে যেন প্যাটের! ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছিল ও।

পঞ্চম রাউণ্ডের শেষে স্টুবনারের ফিসফিসে গলা শুনতে পেল ও, ওকে কি তুমি এই রাউণ্ডেই শুইয়ে দিতে পারো ?

চোখ বুজে—প্যাটের জবাব।

দু রাউণ্ড পর স্টুবনার বললেন, জানো তো, আজ পর্যন্ত কেউ ওকে নক-আউট করতে পারে নি।

হাসল প্যাট, 'তাহলে হয়ত আমার আঙ্গুলের গাঁটগুলোই ভাঙবে। আমার ঘুষিকে আমি চিনি। ওটা যখন কারুর ওপরে গিয়ে পড়ে, তখন একটা কিছু ঘটেই। তা, ও যদি চিৎ না হয়, তাহলে হয়ত আমার গাঁটগুলোই ভাঙবে।

তেরো রাউণ্ডের শেষে স্টুবনার শুধোলেন, 'এই রাউণ্ডে হতে পারে ?'

'বলছি তো, যে-কোন সময়ই হতে পারে।'

'বেশ। পনের রাউণ্ড অবধি টেনে নিয়ে যাও।'

চতুর্দশ রাউণ্ডে উড়ন্ত ডার্‌ম্যান যেন নিজেকে উজাড় করে দিল। ঘণ্টা পড়া মাত্রই ও ধেয়ে গেল রিং-এর উল্টোদিকে, যেখানে প্যাট সবে মাত্র উঠে দাঁড়াচ্ছে আস্তে আস্তে। দর্শকরা চিৎকার করে উঠল উল্লাসে, কারন ওরা জানে উড়ন্ত ডাচ্‌ম্যান এবার নিংড়ে দেবে নিজেকে। বেশ মজা পেল প্যাট। হঠাৎই ও ঠিক করল—এই ভয়ঙ্কর ঝোড়ো আক্রমনকে শুধু চুপচাপ ঠেকিয়ে যাবে, একটাও পাল্টা আঘাত হানবে না। পরের তিন তিনটে মিনিট সত্যিই যেন ঝড় বয়ে

গেল ওর ওপর দিয়ে। একবারও হাত চালাল না ও, হাত চালানোর ভঙ্গীটুকুও করল না। আশ্চর্য এক কৌশলের প্রদর্শনী দেখল উপস্থিত দর্শকরা। কখনও মাথা নিচু, বাঁ হাতে ঢেকে রাখছে মাথাটা আর ডান হাত আড়াল করছে তলপেট। আবার যখন অন্যদিক থেকে আক্রমণ করছে প্রতিপক্ষ, তখন মুখের দুপাশে দেয়াল তুলে রাখছে দুটো হাত দিয়ে, আর কনুই ও সম্মুখবাহু দিয়ে আড়াল করছে শরীরের মধ্যভাগ। সারাক্ষণই ঘুরছে ও, মাঝে মাঝে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে প্রতিপক্ষকে, কিম্বা সামনে ঝুঁকে ব্যর্থ করছে উড়ন্ত ডার্‌ম্যানের আক্রমণ! কিন্তু সারাক্ষণে একবারও পাল্টা আঘাত বা আঘাত করার ভান করল না ও। শুধু ঠেকিয়ে গেল ঝড়, আর ওর শরীরের নানা জায়গায় ফুটে উঠল কালশিরার দাগ।

রিং-এর খুব বসেছিল যারা, তারা প্রশংসা করতে বাধ্য হল। কিন্তু দূরের দর্শকরা আসল ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে খাড়া হয়ে উঠল, জয়ধ্বনি দিল উড়ন্ত ডার্‌ম্যানের নামে। ওরা ভাবছে—প্যাট অসহায় হয়ে পড়ে ঠ্যাঙানি খাচ্ছে বেধড়ক। শেষ হল ঐ রাউণ্ডের লড়াই। বিমূঢ় দর্শকরা হাঁ করে দেখল—নিজের কোনটার দিকে বেমালুম হেঁটে যাচ্ছে প্যাট। এ কী করে সম্ভব? আঘাতের বন্যা বয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে, অথচ এতটুকু হেল্‌দোল্ নেই ওর।

'কতক্ষণ লাগবে ওকে ফেলতে?' স্ট্‌বনার উদ্বিগ্ন।

প্যাটের গলায় স্থির প্রত্যয়, 'দশ সেকেণ্ডের মধ্যে।' মিলিয়ে দেখে নেবেন।

না, কথায় কোন ভুল ছিল না। ঘণ্টা পড়ামাত্রই ছিটকে উঠে দাঁড়াল প্যাট। স্পষ্ট বোঝা গেল, সারা লড়াইতে এই প্রথম প্রতিপক্ষের ওপর সত্যি সত্যি ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে ও, ব্যাপারটা বুঝতে একজন দর্শকেরও অসুবিধে হল না। প্রতিপক্ষের মেজাজ আঁচ করতে দেরি হল না উড়ন্ত ডার্‌ম্যানেরও, আর এই প্রথম, নিজের লড়িয়ে জীবনে এই প্রথম, রিং-এর মাঝখানে প্যাটের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে স্পষ্টতই, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠল ও। এক সেকেণ্ডের কয়েক ভগ্নাংশ দুই যুযুধান প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে রইল পরস্পরের মুখোমুখী। তারপরই উড়ন্ত ডার্‌ম্যান ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রতিপক্ষের ওপর, আর প্যাট শুধু ঠিক সময়ে জয়ের নেশা নিয়ে ডান হাতে একটা ঘুষি চালাল। লুটিয়ে পড়ল উড়ন্ত ডার্‌ম্যান।

এই লড়াইটার পর থেকেই বাড়তে শুরু করল প্যাটের খ্যাতি। ক্রীড়াজগতে, ক্রীড়া-সাংবাদিকদের কাছে গ্রাহ্য হয়ে উঠল ও, মানুষের নজর এসে পড়ল ওর ওপর। উড়ন্ত ডার্‌ম্যানকে এই প্রথম কেউ নক-আউট করল। তার বিজেতা

মুষ্টিযোদ্ধাটি চিহ্নিত হল আত্মরক্ষার যাদুকর হিসেবে। না, এখন আর কেউ প্যাটের আগের জয়গুলোকে ফাঁকতালে জিতে যাওয়া বলে মনে করছে। সকলেই একমত—এ এক সব্যসাচী যোদ্ধা, দুটো হাতই এর সমান তালে চলে। এক দৈত্যের আবির্ভাব ঘটেছে রঙ্গমঞ্চে, এ অনেকদূর যাবেই। সাংবাদিকরা মন্তব্য করল—তৃতীয় শ্রেণীর পাতি মুষ্টিযোদ্ধাদের সঙ্গে লড়ে নিজেকে নষ্ট করার সময় ও পার হয়ে এসেছে। কোথায় গেল কেন মেঞ্জিস, ক্রুদ্ধ রেড, বিল টারওয়াটার, আর্নেস্ট লমন? এগিয়ে আসুক তারা, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামুক এই হঠাৎ উঠে আসা অসাধারণ মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে। ওর ম্যানেজারই বা করছেটা কী? চ্যালেঞ্জটা ছুঁড়ে দিক সবার সামনে।

তারপর, হঠাৎই একদিন খ্যাতির শিখরে উঠে গেল প্যাট। এতদিনের চেপে রাখা খবরটা ফাঁস করলেন স্টুবনার। জানিয়ে দিলেন, আজকের এই তরুণ যোদ্ধাটি হচ্ছে পুরনো আমলের সেই বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা প্যাট গ্লেণ্ডনেরই পুত্র। তৎক্ষণাৎ লোকে ওর নাম দিল ছোট প্যাট গ্লেণ্ডন। ছুটে এল ক্রীড়াজগতের লোকেরা, সাংবাদিকরা। তারা ওকে শ্রদ্ধা জানাতে চায়, সাক্ষাৎকার করতে চায়, ওকে নিয়ে লিখতে চায়।

বেন মেঞ্জিস থেকে শুরু করে বিল টারওয়াটার পর্যন্ত চারজন দ্বিতীয় মুষ্টিযোদ্ধাকেই একে একে চ্যালেঞ্জ জানাল প্যাট। চারজনই নক-আউট। এই চারটে লড়াইয়ের জন্য বেশ ঘোরাঘুরি করতে হল ওকে। চারটে লড়াই অনুষ্ঠিত হল চার জায়গায়—গোল্ডফিল্ড, ডেন্‌ভার, টেক্সাস আর নিউইয়র্ক। সবটা মিলে অতিক্রান্ত হয়ে গেল বেশ কয়েকটা মাস। আসলে বড় বড় লড়াইয়ের ব্যবস্থাপনা কিছুটা সময়সাপেক্ষ, আর ওর প্রতিদ্বন্দ্বিরাও ট্রেনিং-এর জন্য বেশ কিছু সময় চেয়ে বসেছিল।

দ্বিতীয় বছরটা কেটে গেল হেভিওয়েট দুনিয়ার মইয়ের ঠিক নিচেকার ছ'জন মুষ্টিযোদ্ধাকে হারাতে। এই মইয়ের একেবারে চূড়ায় অটল আসনে বসে আছে জিম হ্যানফোর্ড। অপরাজিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। এই ওপরের দিকের ধাপগুলো পেরোতে বেশ কিছু সময় লেগে গেল। যদিও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে আর ক্রীড়া-জগতের কেষ্ট বিষ্টুদের মতামতের চাপ সৃষ্টি করে সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ওর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বাধ্য করতে কার্পণ্য করেন নি স্যাম স্টুবনার। ইংল্যাণ্ডে ভূমিশয্যা নিল উইল কিং। টম হ্যারিসনকে চূর্ণ করার জন্য পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক পথ পাড়ি দিতে হল গ্লেণ্ডনকে। লড়াইটা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়, মুষ্টিযুদ্ধ দিবসে।

আর এর সাথে তাল মিলিয়ে স্ফীত হয়ে উঠছে অর্থের ঝুলি। প্রথম দিকের লড়াইগুলো থেকে প্যাটের পকেটে আসত শতখানেক করে ডলার। এখন অঙ্কটা দাঁড়িয়েছে লড়াই পিছু কুড়ি থেকে তিরিশ হাজার ডলারে। সিনেমার লোকেদের কাছ থেকেও ছবির বিনিময়ে পাওয়া যায় বেশ মোটা দক্ষিণা। বৃদ্ধ প্যাট প্রেগুনের সঙ্গে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, এই অর্থ থেকে ম্যানেজার হিসেবে নিজের ভাগটা কেটে নেন স্টুবনার। এক কথায়, বিপুল খরচ সত্ত্বেও, স্টুবনার আর প্যাট, দুজনেই এখন যথেষ্ট ধনী হয়ে উঠেছে। দুজনেই সংযমী, মিতব্যায়ী বলেই আজ ওদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে এই জায়গায় এসে পৌছনো। কোন বাজে খরচের পথে ওরা হাঁটে না।

সান ফ্রান্সিসকোয় একাধিক ফ্ল্যাট-অ্যাপার্টমেণ্ট কিনলেন স্টুবনার। এত বড় সব বাসস্থানের কথা প্যাট কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। তবে, জুয়াড়িদের গোপন সঙ্ঘের লোকেরা ইচ্ছে করলে স্টুবনারের মোট সম্পত্তির একটা আন্দাজ দিতে পারত বটে। সিনেমার লোকেদের কাছ থেকেও স্টুবনারের পকেটে লভ্যাংশ বাবদ থোক থোক অর্থের আমদানী হয়। না, এ সবের বিন্দুবিসর্গও জানা নেই প্যাটের।

স্যাম স্টুবনারের কাছে এখন সবথেকে জরুরী কাজ হচ্ছে তার তরুণ যোদ্ধাটির সরলতাটুকু টিকিয়ে রাখা। কাজটা কঠিন নয় মোটেই। ব্যবসায়িক ব্যাপার-স্যাপারে এতটুকুও উৎসাহ নেই প্যাটের। আর একটা সুবিধে হল, যে-কোন জায়গাতে গিয়ে অবসর সময়টা ও কাটায় শিকার করে আর মাছ ধরে। ক্রীড়াজগতের কারুর সঙ্গে কখনোই মাখামাখি করে না ও, ভীষণ লাজুক, নির্জনতা প্রিয়। খেলাধুলোর জগতের বাজারী কেচ্ছাকেলেঙ্কারীতে নাক না গলিয়ে চলে যায় আর্ট গ্যালারিতে কিম্বা বসে থাকে কবিতার বইয়ে মুখ ডুবিয়ে। প্যাটের প্রশিক্ষক আর অনুশীলন সঙ্গীদেরকেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন স্টুবনার—বক্সিং জগতের নোংরামি সম্বন্ধে একটা কথাও যেন প্যাটের কানে না যায়। অর্থাৎ, প্যাট প্রেগুন আর বাইরের দুনিয়ার মধ্যে সবরকমে একটা দেয়াল খাড়া করে রেখেছেন তিনি। তাঁর উপস্থিতি ছাড়া কোন সাংবাদিকও প্যাটের সাক্ষাতকার নিতে পারে না।

শুধু একবার দেয়াল ভাঙার উপক্রম হয়েছিল। হেণ্ডারসন-এর সঙ্গে লড়াইয়ের ঠিক আগের একটা ছোট ঘটনা ঘটল। হোটেলের করিডর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল প্যাট। তখনই, ওর কানের কাছে, ফিসফিস্ করে, এক লক্ষ ডলারের প্রস্তাব

পেশ করেছিল কেউ একজন। বরাত জোরে বেঁচে গিয়েছিল লোকটা। নিজেকে সংযত করে, চুপচাপ চলে গিয়েছিল প্যাট, কোন উত্তর দেয় নি। পরে স্টুবনারকে ঘটনাটা জানায় ও। সবটা শুনে ম্যানেজার বললেন:
'ও-সব নেহাৎ ফালতু ব্যাপার প্যাট। ওরা তোমার সঙ্গে একটু মজা করছিল আর কি।' প্যাটের নীল-নীল চোখের ঝলকটুকু নজর এড়াল না স্টুবনারের। 'আরও খারাপ কোন উদ্দেশ্যও অবশ্য থাকতে পারে এর পিছনে। যদি তুমি ওদের কথায় রাজি হয়ে যেতে, তাহলে হয়ত খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হত খবরটা। ব্যস, শেষ হয়ে যেত তোমার বক্সিং-জীবন। তবে আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। এখন আর ও-সব তেমন ঘটে না। আসলে বক্সিং-জগতের মধ্যযুগের সময় থেকে এরকম কিছু গাল-গল্প লোকের মুখে মুখে চলে আসছে। হ্যাঁ, আগের আমলে কিছু নোংরামি-টোংরামি চলত বটে, কিন্তু আজকের দিনের কোন প্রতিষ্ঠিত মুষ্টিযোদ্ধা কিম্বা ম্যানেজার আর ও-সবে নাক গলানোর সাহসই পাবে না। জেনে রাখো প্যাট, পেশাদার বেস্‌বলের সঙ্গে যুক্ত লোকজনদের মতো আমাদের এই বক্সিং-জগতের সঙ্গে যুক্ত লোক-জনরাও অত্যন্ত সৎ, সাদাসিধে। এখানে কোন প্যাঁচ-ঘোঁচের বালাই নেই।'
ভাষণ দিয়ে চলেছেন ম্যানেজার, কিন্তু তাঁর মন জানে—হেণ্ডারসনের সঙ্গে আসন্ন লড়াইটা বারো রাউণ্ডের আগে শেষ করা যাবে না (সিনেমার লোকদের সঙ্গে সে-রকম বন্দোবস্তই করা আছে), আবার চোদ্দ রাউণ্ডের বেশিও চালানো চলবে না। তিনি আরও জানেন, লড়াইটার ওপর এত বেশি বাজি ধরা হয়েছে যে হেণ্ডারসন নিজেই কথা দিয়েছে চোদ্দ রাউণ্ডের বেশি টিকবে না, হার মেনে নেবে।
আর প্যাট—না, আর কখনও ওর কাছে কোন প্রস্তাব নিয়ে এগোতে পারে নি কেউ—মন থেকে ঝেড়ে ফেলল গোটা ব্যাপারটা, বিকেলটা কাটানোর জন্য বেরিয়ে পড়ল ক্যামেরা নিয়ে, রঙীন আলোকচিত্র তুলতে। এই মুহূর্তে ছবি তোলাটাই ওর প্রিয় নেশা। আসলে ছবি ওর একান্ত প্রিয় জিনিস, কিন্তু নিজে নিজে ছবি আঁকাটা রপ্ত নেই একেবারেই। কাজেই, দুধ না পেয়ে ঘোল, ক্যামেরা। হাত-ব্যাগে ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত এক রাশ বই নিয়ে ঘোরে ও, অনেকটা সময় কাটায় ডার্করুমে, নিজে নিজেই বোঝার চেষ্টা করে বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো।
মুষ্টিযুদ্ধের জগৎ থেকে ও অনেক দূরে, একেবারে নিস্পৃহ। মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত আর কোন যোদ্ধা নিজের জগৎ থেকে এতটা দূরে থেকেছে বলে জানা যায় না। আশপাশে যারা আসে, তাদের সঙ্গে আলাপ করার মতো কোন

কথা ওর ভাণ্ডারে নেই। ফলে, লোকে ওকে বলে গোমড়া-মুখো, অসামাজিক। এইসব সাত-পাঁচ মিলে-জুলে খবরের কাগজের পাতায় ওর একটা বিশেষ পরিচয় গড়ে উঠতে লাগল। তারা বলল, এই ছোট প্যাট গ্রেগুন হচ্ছে একটা ষাঁড়ের মতো পেশীওয়ালা বোবা বর্বর, আর জনৈক অকালপক্ক ক্রীড়া-সাংবাদিক ওর নাম দিল 'দুর্বার বর্বর!' নামটা লুফে নিল লোকে। হ্যাঁ, লাগ্‌সই একটা নাম পাওয়া গেছে বটে! তারপর থেকে যখনই ওকে নিয়ে কিছু লেখা হয়েছে কাগজে, তখনই সে লেখার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ঐ নামটা। এমনকি অনেক সময় হেডিং হিসেবে কিম্বা কোন ছবির নিচে কোনরকম উদ্ধৃতি-চিহ্ন ছাড়াই বড় হরফে লিখে দেওয়া হয়েছে—দুর্বার বর্বর! ততদিনে সারা দুনিয়া জেনে গেছে—কে এই বর্বর। এইসব ঘটনার ফলে প্যাট আরও গুটিয়ে নিল নিজেকে, আর খবরের কাগজের লোকদের সম্বন্ধে একটা তিক্ত অনুভূতি সৃষ্টি হল ওর মধ্যে।

তবে, লড়াই সম্বন্ধে ওর উৎসাহটা কিন্তু বেশ বেড়েছে ইদানীং। এখন ওকে যাদের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে, তারা যথেষ্টই ওস্তাদ মুষ্টিযোদ্ধা। তাদেরকে হারাতে অনেকটাই ঘাম ঝরাতে হচ্ছে ওকে। এরা সব বাছাই-করা মুষ্টিযোদ্ধা, বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। প্রতিটা লড়াই-ই বেশ কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। আগে থেকে নির্দিষ্ট করে রাখা কোন রাউণ্ডে এদের নক-আউট করাটা মাঝে-মাঝে সম্ভবও হচ্ছে না। যেমনটা ঘটল স্লুজ্‌বার্জার-এর সঙ্গে লড়াইয়ের সময়। বিশালদেহী জার্মান এই স্লুজ্‌বার্জার। আঠার রাউণ্ডের মাথায় তাকে নক-আউট করার কথা ছিল। চেষ্টাও করেছিল প্যাট। পারে নি। উনিশ রাউণ্ডেও নয়। অবশেষে কুড়ি রাউণ্ডের মাথায় ওর শক্ত প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম হয়েছিল প্যাট। ধরাশায়ী হয়েছিল স্লুজ্‌বার্জার। এ-সবের ফলে, লড়াই ব্যাপারটা দিন দিন বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠছে প্যাটের কাছে। সেই সঙ্গেই চলছে আরও দীর্ঘ অনুশীলন। তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে নিজেকে এতটুকু অপচয় করে না ও। অনেকটা সময়ই কাটিয়ে আসে পাহাড়ে, শিকারের সন্ধানে। শারীরিকভাবে সবসময়ই পুরোপুরি ফিট থাকে। আর হ্যাঁ, বাবার মতো কোন দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা নেমে আসে নি ওর জীবনে। একবারও ভাঙেনি কোন হাড় কিম্বা আঙুলের কোন গাঁট। এর পাশাপাশি, একটা জিনিস লক্ষ্য করে মনের মধ্যে চাপা উল্লাস অনুভব করেন স্যাম স্টুবনার: জিম হ্যান্‌ফোর্ডকে হারিয়ে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর নিজের সেই পাহাড়-ঘেরা জন্মভূমিতে চিরদিনের মতো ফিরে যাওয়ার কথা আর বলে না তাঁর তরুণ যোদ্ধাটি!

বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হবার চূড়ার দিকে জোরকদমে এগিয়ে চলেছে প্যাট। বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন জিম হ্যানফোর্ড প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে—প্যাট গ্রেগুন তার বাকি চারজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করতে পারলে সে নিজে এই তরুণ যোদ্ধার মুখোমুখী হবে। ছ' মাসের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ল দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী: কিড ম্যাক্‌গ্রাথ আর ফিলাডেলফিয়া জ্যাক ম্যাক্‌ব্রাইড। সামনে এখন শেষ দু'জন: ন্যাট পাওয়ার্স আর টম ক্যান্নাম। সবকিছুই হয়ত এগিয়ে যেত ঠিকঠাক, হিসেবমতো, যদি না মাঝখানে এসে দাঁড়াত অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় একটি মেয়ে, আর যদি না সান ফ্রান্সিসকোর 'কুরিয়ার জার্নাল'-এর এই মহিলা সাংবাদিকটিকে প্যাটের সাক্ষাতকার নেওয়ার অনুমতি দিতেন স্যাম স্টুবনার!

তরুণীটির নাম মড স্যাংস্টার। বিপুল বিত্তবান পরিবারের মেয়ে। ওদের বংশের আদিপুরুষ জ্যাকব স্যাংস্টার লোটাকম্বল গুটিয়ে চলে গিয়েছিলেন সুদূর পশ্চিমে, কাজ করতেন খেতমজুর হিসেবে। নেভাদা অঞ্চলে তিনি এক বিশাল খনি আবিষ্কার করেন—সোহাগার খনি। প্রথম দিকে মাল পাঠাতেন খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে। তারপর দিন ফেরে, মাল পাঠানোর জন্য নিজের খরচে একটা রেলপথ বানিয়ে নেন। সোহাগার মুনাফা থেকে ক্যালিফোর্নিয়া, অরিগন আর ওয়াশিংটন অঞ্চলে হাজার হাজার বর্গমাইল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বনভূমি খরিদ করেন জ্যাকব, শুরু করেন কাঠের কারবার। আরও পরে, ব্যবসার পাশাপাশি রাজনীতির দুনিয়ায় পা রাখেন তিনি। বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা, বিচারক আর কর্মীকে পুষে রাখেন অর্থ দিয়ে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এক বিশাল শিল্প-সাম্রাজ্যের পরিচালক হিসেবে। মারা যান বিপুল সম্মান আর হতাশার বোঝা মাথায় নিয়ে, তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কিছু কলঙ্কের দাগ, ভবিষ্যত ঐতিহাসিকের খোরাক, আর সেই সঙ্গেই রেখে যান বিপুল অর্থের পাহাড়, যা নিয়ে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে শুরু হয় চূড়ান্ত খেয়োখেয়ি। আইনী, শিল্পগত আর রাজনৈতিক লড়াই-এর ঝড় বয়ে যায় পুরো একটা প্রজন্ম জুড়ে। ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষ হতবাক,

বিমূঢ়। ফলস্বরূপ চার ভাইয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয় পরস্পরের প্রতি চরম ঘৃণা আর চূড়ান্ত তিক্ততা। জীবনের মাঝামাঝি সময়ে ছোটভাই থিওডোর একেবারে বদলে যান, বিক্রী করে দেন নিজের বিশাল পশুখামার, আর সমস্তরকম দুর্নীতির বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লাগেন। স্থানীয় লাখপতি-কোটিপতিদেরও রেহাই দেন নি থিওডোর। যে কলঙ্কের দাগ রেখে গিয়েছিলেন জ্যাকব স্যাংস্টার, তা ধুয়ে-মুছে সাফ করার জন্য ডন্ কিহোতের মতো এক অসম্ভব প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তিনি। থিওডোর স্যাংস্টারেরই বড় মেয়ে এই মড স্যাংস্টার। স্যাংস্টার বংশের পুরুষদের মধ্যে থেকে বরাবরই অনেক লড়িয়ে, শক্ত-সমর্থ লোক উঠে এসেছে, আর মেয়েরা নিয়ে এসেছে অপূর্ব সৌন্দর্যের ডালি। মডের মধ্যেও সেই সৌন্দর্যের অনাবিল প্রতিচ্ছবি। বংশানুক্রমিক অ্যাডভেঞ্চারের নেশা থেকেও নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারে নি ও। এই বয়সে এমন অনেক কাণ্ড ঘটিয়েছে, যেগুলো অন্য মেয়েদের পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক নয়। অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারিনী হওয়া সত্বেও, আজও ও অবিবাহিতা। ইউরোপ থেকে এসেছে কিছুদিন, কিন্তু কোন জীবনসঙ্গী জুটিয়ে আনে নি সেখান থেকে। নিজের সম্পত্তির অনেকটা ভাগও ছেড়ে দিয়েছে। খেলাধুলোতেও কমতি নেই। রাজ্যের টেনিস চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। বাজি ধরে হেঁটেছিল সান ম্যাটো থেকে সান্তা ক্রুজ পর্যন্ত, তা নিয়ে বিস্তর লেখালিখিও হয়েছিল কাগজে। একবার তো বার্লিনগেম্-এর একটা পোলো খেলার প্র্যাকটিসে পুরুষদের দলে খেলে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল রীতিমতো। এ-সবের পাশাপাশি শিল্পের জগতেও ওর স্বচ্ছন্দ যাতায়াত। সান ফ্রান্সিসকোর লাতিন কোয়ার্টারে নিজস্ব একটা স্টুডিও ছিল ওর।

বাবা থিওডোর স্যাংস্টারের ঐ সব সংস্কারমূলক আক্রমণ প্রবল হয়ে না ওঠা পর্যন্ত এইসব চালিয়ে যাচ্ছিলো মড। চূড়ান্ত স্বাধীনমনা এক মেয়ে, খুশি মনে নিজেকে সমর্পণ করার মতো কোন পুরুষের দেখা যে পায় নি, আর প্রণয় প্রার্থীদের দেখে শুনে যে তিতিবিরক্ত—সেই মেয়ে কি পারে তার নিজের জীবনে বাবার হস্তক্ষেপ মুখ বুজে মেনে নিতে? মানতে পারে নি মড। বেরিয়ে এসেছিল ঘর ছেড়ে, কাজ নিয়েছিল কুরিয়ার জার্ণাল-এ। শুরুর সময় মাইনে পেত সপ্তাহে কুড়ি ডলার, কিছুদিনের মধ্যেই সেটা লাফ দিয়ে পঞ্চাশ ডলারে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গীত, নাটক আর চিত্রকলার সমালোচনা করাটাই ওর মূল কাজ। জায়গা বুঝে সাংবাদিকসুলভ চমক ছাড়তেও কসুর করে না ও। যেমন, নিউইয়র্কের অন্তত ডজন খানেক বাঘা বাঘা সাংবাদিক যখন মর্গ্যানের খোঁজে হন্যে হয়ে

মাথা খুঁড়ে বেড়াচ্ছে, ও তখন ডুবুরির পোশাক পরে হাজির হয়েছিল গোল্ডেন গেট-এর তলদেশে। ওদের কাগজে ছাপা হয়েছিল মর্গ্যানের একটা দীর্ঘ সাক্ষাতকার। পক্ষীমানব নামে পরিচিত রুড যখন সেই রিভারসাইড পর্যন্ত উড়ে গিয়ে অবিরাম উড্ডয়নের সমস্ত রেকর্ড ভেঙেছিল, তখন তার সহযাত্রিনী হয়েছিল মড—লেখার জন্য।

না না, তাই বলে মড স্ট্যাংস্টার কিন্তু কোন দুর্দান্ত রণরঙ্গিনী-ধাঁচের মেয়ে নয়। ধূসর দুটো চোখ, রোগা চেহারা, এমন কিছু লম্বা নয়, যে-কোন মেয়ের তুলনায় হাত-পাগুলো অস্বাভাবিক রকম ছোট। সমস্ত কাজকর্মে নিজের নারীসুলভ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা ওর সহজাত। বয়স? তেইশ-চব্বিশ হবে।

অসাধারণ এই নবীন মুষ্টিযোদ্ধা প্যাট গ্লেণ্ডনের সাক্ষাতকার নেওয়ার কাজটা ও নিজেই চেয়ে নিয়েছিল সম্পাদকের কাছ থেকে। প্যালেস গ্রিল্-এ একবার সান্ধ্য পোশাক পরা বব ফিজ্‌সিমন্‌স্‌কে এক ঝলক দেখার কথা বাদ দিলে, আর কোন মুষ্টিযোদ্ধাকে সামনাসামনি কখনো দেখে নি ও। দেখার কোন কৌতূহলও অনুভব করে নি কোনদিন। স্যাট পাওয়ার্স-এর সঙ্গে লড়ার আগে অনুশীলন করার জন্য সান ফ্রান্সিসকোয় যখন পা রাখল প্যাট গ্লেণ্ডন, তখন, জীবনে এই প্রথম, কোন মুষ্টিযোদ্ধাকে দেখার একটা কৌতূহল জেগে উঠল মডের সাংবাদিক মনের প্রত্যন্তে। দুর্বার বর্বর! হুঁ, একবার দেখতে হচ্ছে তো জীবটিকে! পত্রপত্রিকায় যে-সব খবর বেরিয়েছে প্যাট গ্লেণ্ডন সম্বন্ধে, সেগুলো পড়ে-টড়ে ওর মনে হয়েছিল—লোকটা অনেকটা নররাক্ষস-টররাক্ষস গোছের, চূড়ান্ত নির্বোধ, আর কোন জংলী জানোয়ারের মতো গোমড়ামুখো, হিংস্র ধরণের। না, ঐ দুর্বার বর্বরের যে সমস্ত ছবি-টবি দেখেছে ও, সেগুলোতে অবশ্য এ-রকম কোন ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিন্তু ঐ-সব ছবিতে ওর পেশীগুলো যেভাবে ফুটে উঠেছে, তা দেখলে লোকটাকে নররাক্ষস ছাড়া আর কী-ই বা ভাবা যায়! কাজেই, কৌতূহল জিইয়ে রেখে আর লাভ কী! স্টুবনারের সঙ্গে আগে থেকে দিন-ক্ষণ ঠিক করে, কাগজের একজন ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে মড স্ট্যাংস্টার হাজির হল ক্লিফ হাউসের অনুশীলন চত্বরে।

কিন্তু শুরুতেই বাগ্‌ড়া। বেঁকে বসল প্যাট। আরামকেদারায় বসে ছিল ও। একটা পা বাইরে, আরেক পায়ের ওপর উল্টে রাখা শেকসপিয়ারের সনেট-সংকলন। মহিলা সাংবাদিকটির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছিল ও।

"এ-সব ব্যাপারে ওনারা কী করতে আসেন? লড়াইটা কি ওনাদের জায়গা?

বক্সিং সম্বন্ধে ওঁরা জানেনটাই বা কী? বক্সার লোকগুলোও তো ভালো নয়। আমি এমন কিছু দ্রষ্টব্য বস্তু-টস্তু নই। এই মহিলা নির্ঘাৎ আমাকে দ্রষ্টব্য করে তুলতে চান। অনুশীলন চত্বরে কোন মেয়েকে বরদাস্ত করতে আমি রাজি নই, তা সে তিনি সাংবাদিকই হোন আর যা-ই হোন।'

'ইনি কিন্তু কোন হেঁজিপেঁজি সাংবাদিক নন প্যাট। স্ট্যাংস্টারদের নাম শুনেছ? ঐ যারা বিশাল বড়লোক?' স্টুবনার আগ বাড়ান।

ঘাড় নাড়ল প্যাট—শুনেছে।

'শুনেছো তো? তা, ইনি হচ্ছেন সেই বংশের মেয়ে। বড় বড় ঘরের লোকেদের সঙ্গে রাতদিন ওঠাবসা। ইচ্ছে করলে এইসব কাজকর্ম না করেও দিব্যি পায়ের ওপর পা তুলে জীবন কাটাতে পারতেন। ওনার বাবার সম্পত্তির পরিমাণ, তা ধরো না কম করেও পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার তো হবেই।'

'তাহলে উনি খামোকা খবরের কাগজে চাকরি করতে গেলেন কেন? অন্য কোন বেকার ছেলে তো পেতে পারত কাজটা!'

'আসলে বাপের সঙ্গে কী-সব ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। তখন ওনার বাবা সান ফ্রান্সিসকো থেকে সব দুর্নীতি দূর করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তা, ঝগড়া-টগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন উনি। ব্যস, এই আর কি। বাড়ি ছাড়লেন, চাকরি নিলেন। হ্যাঁ, আর একটা কথা এইবেলা বলে রাখি প্যাট। ইংরিজী ভাষাটা একেবারে গুলে খেয়েছেন উনি, একেবারে জলভাত যাকে বলে। ওনার ধারে-কাছে আসার মতো কোন কলমবাজ এ তল্লাটে নেই।'

প্যাটের দু'চোখে কৌতূহলের ছায়া। উৎসাহিত স্টুবনার তড়িঘড়ি জানালেন, 'উনি আবার কবিতাও লেখেন, জানো তো! অনেকটা তোমার মতোই আর কি। তবে ওনার কবিতাগুলো বোধহয় তোমার থেকে একটু ভালো, কেননা একবার নিজের কবিতার একটা বই ছাপিয়েছিলেন উনি, গোটা একটা বই! সিনেমা নিয়েও লেখেন। এখানকার সমস্ত বড় বড় অভিনেতাদের সাক্ষাত্কার নিয়েছেন উনি।'

'হ্যাঁ, কাগজে ওনার নামটা দেখেছি আমি', প্যাটের মন্তব্য।

'নিশ্চয়ই দেখেছ। আর উনি যে তোমার সাক্ষাতকার নিতে এসেছেন, সেটা তোমার পক্ষে খুব সম্মানজনক ব্যাপার। না না, তোমাকে কোন ঝামেলা-টামেলা পোয়াতে হবে না। আমি তো আছি। যা বলার আমিই বলে দেব'খন। বরাবরই তো তাই করে আসছি।'

কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে ম্যানেজারের দিকে তাকাল প্যাট।

'হ্যাঁ, আর একটা কথা প্যাট। মনে রেখো, এইসব সাক্ষাতকার-টাক্ষাতকার দেওয়াটা তোমার কাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিনা খরচে বিরাট বিজ্ঞাপনের কাজ হয়ে যায়। অর্থ দিয়ে ওটা কেনা যায় না। এ-সব পড়ে লোকের কৌতূহল জাগে, লড়াইয়ের সময় ভীড় বাড়ে, আর যত ভীড় ততই নগদ আমদানী।' একটু থামলেন স্টুবনার, কান পেতে শুনলেন কিছু, ঘড়ি দেখলেন।

'ঐ বোধহয় উনি এলেন। যাই, ওঁকে নিয়ে আসি গিয়ে। চুপিচুপি বলে দেব যেন ছোট করে কাজের কথাগুলো সেরে নেন। খুব একটা সময় খরচ হবে না, দেখে নিয়ো।' বলতে বলতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন স্টুবনার, তারপর ফিরে বললেন, 'একেবারে ঠোঁট সেলাই করে বসে থেকো না যেন। প্রশ্ন করলে দু'চারটে-উত্তর টুত্তর দিয়ো।'

টেবিলের ওপর সনেটের বইটা রেখে দিয়ে একটা খবরের কাগজ তুলে নিল প্যাট। খুব মন দিয়ে কিছু পড়ার ভাব। ঠিক তখনই ঘরে পা রাখলেন স্টুবনার, সঙ্গে মড স্প্যাংস্টার। উঠে দাঁড়াল প্যাট। প্রথম দর্শনেই কোথাও একটা ধাক্কা খেল দুজনে। নীল-নীল চোখের মোহনায় ধূসর একজোড়া চোখের জলতরঙ্গ, দুজনের চোখেই এক আশ্চর্য দ্যুতি, যেন বহুদিন ধরে খুঁজে চলা কোন স্বপ্নের পাখি এখন দুজনেরই ধরা-ছোঁয়ার সীমানায়। কয়েক মুহূর্ত দুজনেই স্থির। পরের মুহূর্তেই সম্বিত ফিরে পেল দুজনে, প্রগাঢ় পরিচয়ের পর হঠাৎই যেন নেমে এল বিভ্রান্তির পর্দা। এ-সব ক্ষেত্রে মেয়েরাই আগে সামলে ওঠে। সেই চিরাচরিত নিয়মে মডই আগে সামলে নিল নিজেকে, মুখে-চোখে এক মুহূর্ত আগের সেই কোন অতলে হারিয়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ছাপও নেই। প্যাটের দিকে এগিয়ে এল ও। অনিশ্চিতির দোলাচল প্যাটের শরীরে। এখন, সামনে, খুব কাছে—এক নারী। নারী! পৃথিবীর বুকে এ কোন্ আজব জীব! এর আগেও দু'চারজন নারীকে দেখেছে ও, কিন্তু তারা কেউ তো ঠিক এর মতো ছিল না! প্যাটের মাথায় এক বিচিত্র ভাবনার চকিত আনাগোনা: আচ্ছা, এই মেয়েকে দেখলে বাবা কী বলতেন? এইরকম কোন মেয়েকেই কি দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে বলেছিলেন তিনি? ভাবনার জানলায় দাঁড়িয়ে প্যাট দেখল—ওর হাতে মেয়েটির হাত! মুষ্টিযোদ্ধার বুকের মধ্যে কৌতূহল, দু'চোখে মুগ্ধ বিস্ময়: কী হাল্কা, কত কোমল এই হাত!

আর মড তখন মুহূর্ত আগের সেই আবেশ কাটিয়ে উঠতে তৎপর। এই অপরিচিত

যুবককে দেখে ঐ আকস্মিক উচ্ছ্বাস, অভাবনীয়। এই যুবকই তো বক্সিং-রিং-এর সেই দুর্বার বর্বর, সেই চরম নির্বোধ পুরুষ, নিজেরই মতো কিছু নির্বোধ পুরুষকে চৌপাট করেছে এ-ই তো! মড স্যাংস্টারের ঠোঁটের কোণে ছোট্ট একটুকরো হাসির ঝিলিক—এখনও ওর হাতটা ধরে আছে প্যাট গ্রেগুন!

'আমার হাতটা যে এবার ফেরৎ দিতে হবে, মিস্টার গ্রেগুন। ওটা ছাড়া তো কাজ করতে পারব না'—মডের গলায় কোমল ভাব।

কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল প্যাট, ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে চোখ নামাল হাতের দিকে, যেখানে ওর শক্ত মুঠোয় বন্দী একটা কোমল হাত। অপ্রস্তুত প্যাট তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিল হাতটা, আর শরীরের সবটুকু রক্ত যেন লজ্জা হয়ে ফুটে উঠল ওর মুখে।

লজ্জার এই আভাটুকু চোখ এড়াল না মডের। পলকের বিস্ময় ওর মনে। না, এই যুবককে যতটা বর্বর বলে ও ভেবেছিল, ততটা বর্বর তো এ নয়! কোন বর্বর কি কখনো লজ্জায় রাঙা হয়? তাছাড়া, দেখে খুশি হল মড, কোন রকম ক্ষমা-টমা চাওয়ার সস্তা ভড়ং-এর ধার-পাশ দিয়েও গেল না প্যাট। যুবকের দু'চোখে শুধু এক উদগ্র দৃষ্টি, উত্তেজনা, যেন বা আবিষ্ট, ঘোর-লাগা, আর দু'গালে আরও আরও রক্ত-আভা।

মডের জন্য একটা চেয়ার টেনে আনলেন স্টুবনার। যন্ত্রচালিতের মতো প্যাটও বসে পড়ল নিজের চেয়ারে।

'ও খুব খুশি হয়েছে, মিস স্যাংস্টার। খুব খুশি হয়েছে', ম্যানেজার আগ বাড়ালেন, 'কি প্যাট, কিছু ভুল বলেছি?'

প্যাট কিছুটা বিরক্ত। ভ্রু দুটো কুঁচকে উঠল ওর। বসে রইল চুপচাপ, নিরুত্তর।

মড শুরু করল, 'মিস্টার গ্রেগুন, আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের। এর আগে কোন মুষ্টিযোদ্ধার সাক্ষাতকার আমার নেওয়া হয় নি। তাই কোন ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে মাপ করবেন।'

ম্যানেজারের প্রস্তাব, 'ওর একটু লড়াই দিয়েই বরং সাক্ষাতকারটা শুরু করুন। ও বরং ততক্ষণ লড়াইয়ের পোশাক-টোশাক পরে নিক, আর সেই ফাঁকে আমি ওর সম্বন্ধে কিছু বলে নিই। হ্যাঁ হ্যাঁ, একেবারে টাটকা খবর-টবরও দেব। তাহলে প্যাট, ওয়াল্‌শ্‌কে বরং ডেকে পাঠাই। দু'এক রাউণ্ড হয়ে যাক, কী বলো?

'না, ও-সব থাক,' গর্জে উঠল প্যাট, যেন জেগে উঠল এক দুর্বার বর্বর,

'সাক্ষাতকার শুরু করুন।'

শুরু হল সাক্ষাতকার। বেশিরভাগ উত্তর যুগিয়ে চললেন স্টুবনারই। মড ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত, প্যাট চুপচাপ। তীক্ষ্ণ চোখে ওর মুখটা দেখল মড: নীলরঙা একজোড়া আয়ত চোখ, ঈগল পাখির ঠোঁটের মতো তীক্ষ্ণ নাক, দৃঢ়সম্বদ্ধ ঠোঁট, আর সেই ঠোঁটের দু'কোণের ভাঁজে এক সতেজ মিষ্টতা। এ মানুষকে কাঠ-গোঁয়ার বলে ভাবতে কষ্টই হয়। কাগজে এতদিন যা লেখালিখি হয়েছে, তা সত্যি হলে ধরে নিতে হয়—এ এক বিভ্রান্তিকর ব্যক্তিত্ব। প্যাটের শরীরে বর্বরতার চিহ্ন খোঁজার চেষ্টা করছিল ও। কিন্তু, কোথায় সে চিহ্ন? সরাসরি প্যাটের মুখ থেকে কিছু শোনার ইচ্ছে ওর। কিন্তু এই মুষ্টিযুদ্ধের দুনিয়া সম্বন্ধে ওর জ্ঞান খুবই কম, ফলে ঠিকমতো প্রশ্ন সাজাতে একটু অসুবিধেই হচ্ছিল। আর কোন প্রশ্ন করলেই মুখের কথা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে তথ্য বিতরণ করে যাচ্ছিলেন স্টুবনার।

'আপনাদের মানে এই মুষ্টিযোদ্ধাদের জীবনটা কিন্তু দারুণ! বলতে বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মড, আপনাদের সম্বন্ধে আরও অনেক কিছুই জানতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা, এইসব লড়াই টড়াই আপনারা কেন করেন? না না, অর্থের দিকটা বাদ দিয়েই জানতে চাইছি। (স্টুবনারের মুখ বন্ধ করার জন্যই শেষ কথাটা বলা) মানে, লড়তে কি আপনাদের খুব ভালো লাগে? অন্য লোকেদের সঙ্গে হাতাহাতি করাটা কি খুব দারুণ কিছু? মানে, কিছু মনে করবেন না, আমি হয়ত ব্যাপারটা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না।

প্যাট আর স্টুবনার একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল, কিন্তু একবার ম্যানেজারের গলা ছাপিয়ে ভেসে এল প্যাটের গলা—

'প্রথম দিকে আমার এসব ঠিক ভালো লাগত না—'

তড়িঘড়ি গলা চড়ালেন স্টুবনার, 'মানে, ব্যাপারটা আসলে জলের মতো সহজ ছিল ওর কাছে, এই আর কি।'

কিন্তু পরের দিকে, বলে চলল প্যাট, 'যখন ভালো ভালো বক্সারদের সঙ্গে, বুদ্ধিমান বক্সারদের সঙ্গে লড়তে শুরু করলুম, তখন আমাকে—'

'জেতার জন্যে অনেক বেশি ঘাম ঝরাতে হয়েছে?' মডের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, অনেক বেশি আর তখন থেকেই লড়াই নিয়ে বেশ ভাবনা-চিন্তা করতে হচ্ছে আমাকে। তবে সারাক্ষণ যে ঐ ভাবনাতেই ডুবে থাকতে হচ্ছে, তা নয়। আসলে প্রত্যেকটা লড়াইয়ের জন্যেই বুদ্ধি খাটাতে হচ্ছে, শরীরকে ঠিকমতো

কাজে লাগাতে হচ্ছে। তবে আমি সবসময়ই নিশ্চিত থাকি যে—'

মাঝপথে মুখ খোলেন স্টুবনার, 'ওর সব লড়াইয়ের ফলাফল একই। সবকটা লড়াইতেই ও নক-আউটে জিতেছে।'

প্যাটের মন্তব্য, 'আর এই নিশ্চিতিটার জন্যেই আমি লড়াইয়ের অনেকখানি উত্তেজনা থেকে বঞ্চিত হই।'

'জিম হ্যানফোর্ডের সঙ্গে লড়ার সময় তুমি নিশ্চয়ই কিছুটা উত্তেজনার স্বাদ পাবে,' রসিকতা করেন স্টুবনার।

একটু হাসি খেলে গেল প্যাটের ঠোঁটে, কোন উত্তর দিল না ও।

মড কৌতূহলী, 'লড়াইয়ের সময় ঠিক কী কী মনে হয়, একটু বলবেন ?'

এ-কথার উত্তরে প্যাট যা বলল, তা শুনে চমকে উঠলেন স্টুবনার, চমকে উঠল মড, এমনকি চমকে উঠল ও নিজেও:

'আমি ঠিক এ-সব ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি না। আমার মনে হচ্ছে আপনার আর আমার মধ্যে বলার মতো অনেক দরকারী কথা আছে। আমি—'

হঠাৎই চুপ করে গেল ও। কী বলছে, সেটা বুঝতে পারছিল ও। কিন্তু, কেন ? এ-কথা কেন ভেসে এল ওর মনে ? প্যাট জানে না।

মডের গলায় ব্যগ্র আবেগ, 'ঠিক, ঠিক বলেছেন। অন্য ধরণের কথা না বললে সত্যিকারের সাক্ষাতকার পাওয়া যায় না, মানে আসল মানুষটাকে চেনা যায় না, তাই না ?'

প্যাটের ঠোঁটে সেলাই। বকবক করে চললেন স্টুবনার। স্যাণ্ডো, ভয়াল তুর্কী, জেফ্রিস আর এখানকার অন্যান্য লড়িয়েদের সঙ্গে প্যাটের উচ্চতা, শরীরের বিভিন্ন মাপ আর ছাতি ফোলালে কতটা দাঁড়ায়—তার একটা পরিসংখ্যানগত তুলনা আউড়ে গেলেন গড়গড় করে। এ-সব খবরে মড স্যাংস্টারের বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। ওর হাবভাবের মধ্যেই ফুটে উঠেছিল বিরক্তিটা। হঠাৎই টেবিলের ওপর পড়ে থাকা সনেটের বইটা চোখে পড়ল ওর। বইটা তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে স্টুবনারের দিকে তাকাল মড।

স্টুবনার মুখর, 'ওটা প্যাটের বই। ও খুব ঐ-সব বইপত্তোর পড়ে। এছাড়াও কালার ফটোগ্রাফী, ছবির প্রদর্শনী, আরও সব নানান বিষয়ে ওর খুব উৎসাহ। তবে দোহাই, এ-সব কথা আবার লিখে দেবেন না যেন। বাজারে ওর বদনাম হয়ে যাবে।'

চোখে তুলে গ্রেগুনকে দেখল মড। ওর চোখে ভৎসনার ঝিলিক। প্যাট অপ্রস্তুত। ব্যাপারটা দারুণ লাগছে মডের। এক লাজুক যুবক, শরীর যার দৈত্যের মত, লোকে যাকে বক্সিং জগতের একজন রাজা বলে জানে—সে কবিতা পড়ে, ছবির প্রদর্শনী দেখতে যায়, কালার ফটোগ্রাফী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। না, এ যুবক কোন দুর্বার বর্বর নয়। ওর লাজুকতা, মড বুঝতে পারছে, আসলে সংবেদনশীলতারই বহিঃপ্রকাশ, নিবুদ্ধিতার নয়। শেকস্‌পীয়ারের সনেট। আশ্চর্য! এই দিকটাকে তো খুটিয়ে জানতে হচ্ছে। কিন্তু স্টুবনার কোন সুযোগ দিতে রাজি নন। পরিসংখ্যানের ঝড় বইয়ে দিচ্ছেন তিনি।

মিনিট খানেক পর ঠিকমতো না বুঝেই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটায় এসে পড়ল মড। সনেটের বইটা দেখার পর থেকেই প্যাট গ্রেগুন সম্বন্ধে আবার একটা তীব্র আকর্ষণের নড়াচড়া চলছে ওর মধ্যে। সামনে এক যুবক, তার সুঠাম ঝকঝকে চেহারা, সুন্দর মুখ, দৃঢ়সম্বদ্ধ ঠোঁট, স্বচ্ছ আয়ত চোখ, ছোট ছোট সোনালী চুলে ঢাকা না-পড়া কপাল, শরীর জোড়া এক আশ্চর্য পরিচ্ছন্নতার দীপ্তি—এই সব, আর এ-সবের সীমানা ছাড়ানো কোন এক বোধ টেনে নিয়ে যাচ্ছে মডকে। এভাবে কোনদিন কোন পুরুষ ওকে আকর্ষণ করতে পারে নি। তবু, সেই আকর্ষণের মধ্যেও, মডের মনের মধ্যে ভেসে উঠছে গত পরশু কুরিয়ার জার্নালের অফিসে শোনা জঘন্য গুজবটার কথা।

কথা বলল মড, 'আপনি ঠিকই বলছিলেন। আরও দরকারী কিছু বিষয় নিয়েই কথা বলা উচিত। আমার একটা সন্দেহের কথা জানাচ্ছি, আশাকরি আপনি এই সন্দেহের নিরসন ঘটাতে পারবেন। বলব?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল প্যাট।

'খোলাখুলি বলব? দেখুন, অনেকসময় আমি লোকজনকে এইসব লড়াই-টড়াই নিয়ে কথা বলতে শুনেছি। শুনেছি, এইসব লড়াইয়ের পিছনে নাকি বাজি ধরার একটা ব্যাপার আছে। ও-সব কথায় আমি খুব একটা কান দিতুম না। তবে এটুকু মনে হয়েছে যে বক্সিং-এর সঙ্গে নানারকম প্রতারণা আর লোক-ঠকানো ব্যাপার জড়িয়ে আছে। কিন্তু, সত্যি বলছি, ঐ-সব লোক-ঠকানো কারবারের অংশীদার বলে আপনাকে ঠিক ভাবতে পারছি না। খেলাটাকে খেলা হিসেবেই ভালবাসেন, এ থেকে অর্থও আসে আপনার পকেটে—এ সব ঠিক আছে। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না—'

প্যাটের ঠোঁটের ভাঁজে একটুকরো সহিষ্ণু হাসি। আর স্টুবনার উদ্বিগ্ন, 'এর

মধ্যে আবার বোঝাবুঝির কী আছে? যতসব গাঁজাখুরী গল্প। সাজানো লড়াই, আগে থেকে ঠিক করা লড়াই…হুঁ! এই আমি বলে দিচ্ছি মিস স্যাংস্টার, শুনে রাখুন, ও-সব একেবারে বাজে গুজব। যাকগে, কিভাবে প্যাটকে আবিষ্কার করেছিলুম, বলি শুনুন। ওর বাবা আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন—'

না, আন রাস্তায় হাঁটতে মড স্যাংস্টার রাজি না। প্যাটের দিকে তাকাল ও, 'শুনুন মিস্টার গ্রেগুন, একটা ঘটনার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। মাস কয়েক আগের একটা লড়াইয়ের কথা বলছি। প্রতিদ্বন্দ্বী কে কে ছিল, আমার ঠিক মনে নেই। তো, কুরিয়ার জার্নাল-এর একজন সম্পাদক আমাকে বলেন, ঐ লড়াই থেকে নিজের পকেটে বেশ কিছু অর্থ আমদানী করতে চলেছেন তিনি। না, অর্থ আমদানীর আশা করার কথা কিন্তু বলেননি তিনি। বলেছিলেন—পেতে চলেছি। আরও বলেছিলেন, ভিতরের খবর তাঁর জানা আছে, আর খবরের ভিত্তিতেই লড়াইটা ক' রাউণ্ডে শেষ হবে, তার ওপর বাজি ধরবেন। তাঁর কাছ থেকে শুনেছিলুম, লড়াইটা নাকি উনিশ রাউণ্ডে শেষ হবে। এটা হচ্ছে লড়াইয়ের আগের রাতের ঘটনা। পরের দিন ভদ্রলোক উল্লাসিত হয়ে জানিয়ে গেলেন—লড়াইটা ঠিক উনিশ রাউণ্ডেই শেষ হয়েছে। তো, তখন ও-সব নিয়ে আমি খুব একটা মাথা ঘামাই নি। আসলে এইসব বক্সিং-টক্সিং সম্বন্ধে তখন আমার কোনরকম কৌতূহলই ছিল না। কিন্তু এখন আমার মধ্যে এই কৌতূহলটা দেখা দিচ্ছে। তখন আমি বক্সিং সম্বন্ধে তেমন কিছু জানতুমও না, ফলে ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল। তো, সবটাই তাহলে গাঁজাখুরি গালগল্প হয়, কী বলেন?'

প্যাট অবিচলিত, 'হ্যাঁ ঐ লড়াইটা আমার মনে আছে। ওয়েন আর মার্গওয়েদার এর মধ্যে হয়েছিল লড়াইটা। হ্যাঁ উনিশ রাউণ্ডেই লড়াইটা শেষ হয়েছিল বটে। শুনলেন তো স্যাম, উনি আগেই শুনেছিলেন লড়াইটা ঠিক ঐ রাউণ্ডেই শেষ হবে। এর কী ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?'

'কোন লোক যদি লটারির একটা লাকি টিকিট কিনে ফেলে, তার কী ব্যাখ্যা দেবে তুমি? মূল প্রশ্নটা কৌশলে এড়ানোর চেষ্টা করছেন স্টুবনার, আর সেই সঙ্গেই চেষ্টা করছেন নিজের সবটুকু বোধবুদ্ধি দিয়ে একটা ব্যাখ্যা খাড়া করার; আসলে ব্যাপারটা কী জানো। যারা খুব মন দিয়ে মুষ্টিযোদ্ধাদের কর্ম, শারীরিক অবস্থা, লড়ার ধরন, সহকারী কে কে—এইসব ব্যাপার লক্ষ্য করে, তারা অনেক সময় আগে থেকেই বলে দিতে পারে লড়াইটা ঠিক কোন্ রাউণ্ডে শেষ হবে।

এই ধরো না কোন ঘোড়দৌড়ে একশটা ঘোড়ার মধ্যে কোন্ ঘোড়াটা বাজিমাৎ করবে, তা তো অনেকে আগে থেকেই ঠিকঠাক বলে দিতে পারে। আর একটা কথাও কিন্তু মনে রাখা দরকার, লড়াইতে একজন যেমন জেতে, আর একজন তেমনি হারেও তো বটে। অর্থাৎ একজন যদি আগে থেকে বিজয়ীর নাম বলে দিয়ে থাকে, তাহলে আর একজন কেউ নিশ্চয়ই নামটা ভুল বলেছিল। শুনুন মিস স্থাংস্টার, আমি খুব জোর দিয়ে বলছি, বক্সিং-এর জগতে ও-সব বানানো লড়াই কিম্বা আগে থেকে সাজানো লড়াইয়ের কোন অস্তিত্ব নেই।'

'আপনি কী বলেন, মিস্টার গ্রেগুন?' মড জিজ্ঞাসু।

উত্তর স্টুবনারের ঠোঁটে, 'আমি যা বলেছি, তা-ই। ও খুব ভালো করেই জানে। আমার কথাগুলো একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্যি। ও জীবনে কোন সাজানো লড়াই লড়েনি। কি প্যাট, সত্যি কি না বলো?'

'হ্যাঁ, সত্যি'—প্যাটের গলায় প্রত্যয়। আশ্চর্য, ওর কথা অবিশ্বাস করার মতো জোর মনের মধ্যে খুঁজে পেল না মড।

কপালের ঘাম মুছল মড, যেন মেরে ফেলার চেষ্টা করল মাথার মধ্যে জমে ওঠা বিভ্রান্তির কালো মেঘকে, তারপর বলল, 'শুনুন, গতকাল রাতে ঐ সম্পাদক বলছিলেন আপনার আগামী লড়াইটা কত রাউণ্ডে শেষ হবে, তা নাকি ঠিক করাই আছে।

আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে উঠছিলেন স্টুবনার, কিন্তু বাঁচিয়ে দিল প্যাট।

'মিথ্যে কথা বলছেন আপনাদের সম্পাদক—,'এই প্রথম গলা চড়ল ওর।

মডের গলায় চ্যালেঞ্জের সুর, 'আগের ঐ লড়াইটা সম্বন্ধে কিন্তু উনি মিথ্যে কথা বলেন নি।'

'ন্যাট পাওয়ার্সের সঙ্গে আমার লড়াইটা ক' রাউণ্ডে শেষ হবে বলেছেন উনি'?

মড কোন উত্তর দেওয়ার আগেই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন স্টুবনার, যেতে দাও প্যাট, যেতে দাও। গুলি মারো ওই-সব কথায়। ওইসব গুজব এ লাইনে রটেই থাকে। সাক্ষাতকারটা চালানো যাক বরং।'

ম্যানেজারের কথায় কর্ণপাতও করল না প্যাট। ওর চোখ এখন মডের চোখে—স্থির, নির্নিমেষ। চোখের জমি থেকে মুছে গেছে সেই হাল্কা নীল আভাটুকু। আয়ত দু'চোখের জমিতে এখন এক আশ্চর্য কঠোরতার ছায়াপাত। মড বুঝতে পারে, কোন এক মারাত্মক জায়গায় আঘাত করতে পেরেছে ও, ওর সমস্ত বিভ্রান্তির উত্তর লুকিয়ে আছে এখানেই। সেই সঙ্গেই ও শরীরে এক কাঁপন,

রোমাঞ্চ। প্যাট গ্রেগুনের গলার স্বর আর চোখের দৃষ্টি প্রবেশ করছে ওর চেতনার গহনে। হ্যাঁ, জীবনকে হাতের মুঠোয় ধরতে পারে এই পুরুষ, তার থেকে নিংড়ে বার করে নিতে পারে যে-কোন প্রার্থিত বস্তুকে।

'কোন্ রাউণ্ডের কথা বলেছিলেন আপনাদের সম্পাদক ?' প্রশ্নটা পুনরুচ্চারণ করল প্যাট।

এ-সব ছেলেমানুষী বন্ধ করো প্যাট, দোহাই তোমার,' স্টুবনার আকুল।

মড শান্ত, 'ওনার প্রশ্নের উত্তরটা দিতে দিন আমাকে।'

প্যাট অস্থির, মিস স্ট্যাংস্টারের সঙ্গে আমি নিজেই কথা বলতে পারব। আপনি বাইরে যান স্যাম। ফটোগ্রাফারটির কোন অসুবিধে হচ্ছে কি না, দেখুন।

প্যাট আর স্টুবনারের চোখ পরস্পরের চোখে স্থির। কয়েকটা টানটান, নির্বাক মুহূর্ত। তারপর ধীর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন স্টুবনার, দরজাটা খুললেন, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে শুনতে চাইলেন চরম কথাটা।

'কোন্ রাউণ্ড ?' প্যাটের গলা কঠিন।

মডের গলা কাঁপছে, 'ওনার কথাটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। উনি বলেছিলেন, লড়াইটা শেষ হবে ঠিক ষোল রাউণ্ডে।'

প্যাটের মুখে একরাশ বিস্ময় আর প্রচণ্ড ক্রোধ ঝলসে উঠতে দেখল মড। ম্যানেজার দিকে তাকাল প্যাট, চাউনিতে তীব্র ক্রোধ আর অভিযোগ। মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিল মড—তীরটা আঘাত করেছে চাঁদমারিতে, নিখুঁত লক্ষ্যে।

প্যাটের ক্রোধটা অকারণ হয়। আগামী লড়াইয়ের ব্যাপারে স্টুবনারের সঙ্গে কথা হয়েছে ওর। ঠিক হয়েছে, লড়াইটা অনর্থক দীর্ঘ না করেও, দর্শকদের অর্থটা উশুল করার দিকে একটু নজর দিতে হবে। তাই লড়াইটা শেষ করা হবে ঠিক ষোল রাউণ্ডের মাথায়। আর এখন, খবরের কাগজের পক্ষ থেকে আসা এক নারী, নির্ভুলভাবে বলে দিচ্ছে লড়াইটা ঠিক ক' রাউণ্ডে শেষ হবে!

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন স্টুবনার, নিস্তেজ, বিবর্ণ। প্রাণপণে নিজেকে খাড়া রাখার চেষ্টা করে চলেছেন।

'আপনার সঙ্গে পরে বোঝাপড়া হবে, প্যাটের গলা কঠিন, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে যান্।'

বেরিয়ে গেলেন স্টুবনার। বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। ঘরে এখন ওরা দু'জন, মুখোমুখী। প্যাট নির্বাক। ওর চোখে-মুখে অস্থিরতা, বিভ্রান্তি।

'তাহলে ?' ছোট্ট জিজ্ঞাসা মডের।

উঠে দাঁড়াল প্যাট, অস্থির পায়ে হেঁটে গেল কিছুটা, আবার ফিরে এসে বসল চেয়ারে। জিভ দিয়ে অনবরত ঠোঁটটা ভেজানোর চেষ্টা করছে ও।

অবশেষে, বেশ কিছু সময় খরচ করে, কথা বলতে পারল ও, 'একটা কথা শুনে রাখুন। লড়াইটা ষোল রাউণ্ডে শেষ হবে না।'

মড নির্বাক, কিন্তু ওর ঠোঁটের ভাঁজে এক টুকরো হাসি—অবিশ্বাসের, উপহাসের হাসিটা কাঁটার মতো বিঁধল প্যাটের বুকে।

আবার বলল ও, আপনাদের সম্পাদক যে ভুল বলেছেন, তার প্রমাণ আপনি হাতেনাতেই পাবেন, মিস স্ট্যাংস্টার।

অর্থাৎ, পরিকল্পনাটা পাল্টানো হবে বলছেন? মডের গলায় ঔদ্ধত্যের ছোঁয়া। থরথর করে কেঁপে উঠল প্যাট, গলা আরও কঠিন, 'আমি মিথ্যেকথা বলি না, মেয়েদের কাছেও নয়।'

'না, মিথ্যে তো বলছেন না। আবার, পরিকল্পনাটা যে পাল্টানো হবে, সেটাও অস্বীকার করছেন না। মিস্টার গ্রেগুন, আমি নির্বোধ হতে পারি, কিন্তু আগে থেকেই যদি ঠিক করা থাকে লড়াইটা কোন্ রাউণ্ডে শেষ হবে আর সেটা যদি লোকে জেনেও যায়, তাহলে কোন একটা নির্দিষ্ট রাউণ্ডের বদলে অন্য কোন রাউণ্ডে লড়াইটা শেষ করার মধ্যে ফারাকটা কোথায়—আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি লড়াইটা কোন্ রাউণ্ডে শেষ হবে, আর সেটা আপনি ছাড়া আর একজনও জানবে না।'

কাঁধ ঝাকালো মড, ঠোঁটের কোনে বিদ্রূপের হাসি।

'ঘোড়দৌড়ের টিপ্‌স্ দিচ্ছেন নাকি? ও-সব টিপ্‌স্ তো এভাবেই দেওয়া হয়। আর হ্যাঁ, মনে রাখবেন, আমি কিন্তু একেবারে নির্বোধ নই। বেশ বুঝতে পারছি, কোথাও একটা গণ্ডগোল আছেই। নাহলে নির্দিষ্ট রাউণ্ডটার কথা শুনেই অমন ক্ষেপে উঠলেন কেন? ম্যানেজারের ওপরেই বা এত রাগ কিসের? কেনই বা ঘর থেকে বের করে দিলেন ভদ্রলোককে?'

উঠে দাঁড়াল প্যাট, চুপচাপ গিয়ে দাঁড়াল জানলার সামনে, যেন উত্তর লুকিয়ে আছে বাইরে কোথাও। তারপর মুখ ফেরাল ও মডের চোখ অন্যদিকে, কিন্তু বুঝতে ওর অসুবিধে হচ্ছে না—ঐ যুবকের দুই আয়ত চোখ এখন তার মুখে স্থির। ফিরে এল প্যাট, চেয়ারে বসল।

'মিস স্ট্যাংস্টার, আপনি স্বীকার করেছেন যে আমি আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলি নি। সত্যিই বলি নি।' একটু থামল প্যাট, বুক-খুঁড়ে তুলে আনার চেষ্টা

করল কিছু সঠিক শব্দ, 'আচ্ছা, আমার কথা কি আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন ? একজন····একজন মুষ্টিযোদ্ধার কথা কি আপনি বিশ্বাস করবেন ?'

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল মড—হ্যাঁ, করবে। প্যাটের চোখে চোখ রাখল ও, ঐ গভীর দু'চোখের দর্পণে সত্যের ছায়া দেখছে ও।

আমি বরাবর সরাসরিই লড়েছি, কোন সাজানো লড়াই লড়িনি কোনদিন। জীবনে কোনদিন অসৎপথে অর্থ উপার্জন করি নি, কোন রকম নোংরামিতে জড়াইনি। আপনার কথাগুলো আমাকে ভীষণ নাড়া দিয়েছে। এর উত্তরে কী বলব, জানি না। এক্ষুনি একটা কিছু বলে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবও নয় কিন্তু ব্যাপারটা বড় কুৎসিত। আর ঠিক সেটাই আমাকে অস্থির করে তুলছে। এই লড়াইটা সম্বন্ধে স্টুবনারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমরা দুজনে ঠিক করেছি, লড়াইটা শেষ করা হবে যোল রাউণ্ডে। এখন দেখছি আপনিও সে খবর জানেন। আপনাদের ঐ সম্পাদকের কাছে খবরটা পৌছলো কী করে ? আমি তো কাউকে জানাইনি ! তাহলে ? তাহলে স্টুবনার ছাড়া আর কে হতে পারে ? অবশ্য, যদি····চমকাল প্যাট, কিছু ভাবল যেন, যদি আপনাদের ঐ সম্পাদক নেহাতই বরাত জোরে একটা সঠিক অনুমান করে থাকেন, তাহলে আলাদা কথা। আমি ঠিক মনস্থির করে উঠতে পারছি না। এবার থেকে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে আমাকে, জানতে হবে আসল ব্যাপারটা কী। বিশ্বাস করুন, আমি যা বললাম, তার সবটুকু পুরোপুরি সত্য। এই আপনার হাতে হাত রেখে বলছি।

আবার উঠে দাঁড়াল প্যাট, এগিয়ে গেল মডের কাছে। উঠে দাঁড়াল মড, ওর ছোট্ট হাতটা আশ্রয় পেল প্যাটের বিশাল মুঠির গভীরে ! পরস্পরের চোখে চোখ রাখল ওরা, তারপর দুজনেই, কিছুটা যেন নিজেদের অজান্তেই, চোখ ফেরাল নিজেদের বাঁধা-পড়া হাতের দিকে। মডের চেতনায় নারীত্বের নিবিড় পদসঞ্চার। নিজের নারীত্বকে যেন এত স্পষ্ট করে ও অনুভব করে নি কোনদিন। দুটো হাত, একটা কোমল, হালকা, নরম, অন্যটা বলিষ্ঠ, ভারী পুরুষালী—দুয়ের বাঁধনে এক আশ্চর্য বিদ্যুৎসঞ্চার।

প্রথম কথাটা উচ্চারণ করল প্যাটই, কত অল্পেই আপনার আঘাত লাগতে পারে। আর মড অনুভব করল—যুবকের হাতের চাপ শিথিল হয়ে আসছে, বুঝি বা আদর করছে ওর নরম হাতটুকে।

প্রাশিয়ার সেই প্রাচীন রাজা ভালবাসতেন বিশালদেহী পুরুষদের—কথাটা মনে

হতেই হেসে ফেলল মড। কী বেখাপ্পা ভাবনা। আস্তে আস্তে নিজের হাতটা সরিয়ে নিল ও।

'আজ এখানে আপনাকে পেয়ে খুব ভাল লাগছে আমার,' বলতে বলতে সচকিত হয়ে উঠল প্যাট, তড়িঘড়ি একটা ব্যাখ্যা খাড়া করার চেষ্টা করল, কিন্তু চোখের অতল থেকে ছড়িয়ে পড়া মুগ্ধতার উষ্ণ আলোয় ফুটে উঠল সে ব্যাখ্যার ফাঁকি, 'মানে, আসলে···আসলে এইসব নোংরা ব্যাপার সম্বন্ধে আপনি আজ আমার চোখে খুলে দিয়েছেন বলেই খুব ভাল লাগছে আর কি।'

মডের স্বর ভীষণ নরম, 'আপনাকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। বক্সিং-এর সঙ্গে যে হাজারটা নোংরামি জড়িয়ে আছে, সে কথা এখন সকলেই জানে। অথচ এই বক্সিং জগতের একজন সেরা লোক হয়েও আপনি সে সবের কোন খোঁজই রাখেন না! আশ্চর্য! আমার ধারণা ছিল আপনি সবই জানেন, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আপনি সত্যিই এ-সব স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না! আসলে, অন্য সব বক্সারদের থেকে আপনি একেবারেই আলাদা জাতের মানুষ।'

ঘাড় নাড়ল প্যাট।

'ঠিক বলেছেন। আর সেইজন্যেই এদের থেকে দূরে থাকা উচিত আমার—এইসব বক্সারদের থেকে, উদ্যোক্তাদের থেকে, এমনকি গোটা বক্সিং দুনিয়াটা থেকেই। এত কাল ধরে আমাকে বোকা বানাতে এতটুকুও অসুবিধে হয় নি ওদের। তবু, দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত ওরা আমাকে বোকা বানাতে পারে কি না! নিজের পথ এবার বেছে নিতে হবে আমাকে।'

'মানে? এ-সব পাল্টে দেবেন?' মড রুদ্ধশ্বাস। ও এখন নিশ্চিত, প্যাট গ্লেণ্ডনের পক্ষে কোন কিছুই খুব একটা অসম্ভব নয়!

মাথা নাড়ল প্যাট, 'না, এই নোংরামির জগতে থাকলে মরে যাব। এখানে যদি এতটুকুও সততা না থাকে, তাহলে এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক রাখার দরকার নেই। আর হ্যাঁ, একটা কথা শুনে রাখুন, প্যাট পাওয়ার্স-এর সঙ্গে আগামী লড়াইটা কখনই ষোল রাউণ্ডে শেষ হবে না! আপনাদের সম্পাদকের কথায় যদি কোন সত্যতা থেকে থাকে, তাহলে এবার তাকে ঠকতে হবে, ঠকতে হবে ওদের গোষ্ঠীর সকলকে। ষোল রাউণ্ডের বদলে লড়াইটাকে আরও কয়েক রাউণ্ড টেনে নিয়ে যাব। আমার কথাটা মিলিয়ে দেখে নেবেন আপনি।'

'নিশ্চয়ই এ খবরটা সম্পাদককে জানাব না আমি?' উঠে দাঁড়াল মড। এবার ওকে যেতে হবে।

'না, কিছুই জানাবেন না। ব্যাপারটা যদি ওর অনুমান হয়ে থাকে, তাহলে বাজি ধরতে দিন ওঁকে। আর যদি এর মধ্যে অন্য কোন নোংরামি থেকে থাকে, তাহলে হারুন উনি বাজিতে। এটা শুধুই আপনার আর আমার মধ্যেকার কথা। কোন্ রাউণ্ডে লড়াইটা শেষ হবে, শুনে নিন। না, পুরো কুড়ি রাউণ্ড অবধি টানব না। প্যাট পাওয়ার্স নক-আউট হবে ঠিক আঠার রাউণ্ডের মাথায়।'

'বেশ, আমি ছাড়া এ-কথা আর কেউই জানবে না', কথা দেয় মড।

'আর একটু অনুগ্রহ চাইব আপনার কাছে,' বলে ওঠে প্যাট, 'হয়ত একটু বেশিই চেয়ে ফেলছি।'

মডের মুখে নীরব সম্মতি, যেন চাওয়ার আগেই দেওয়া হয়ে গেছে সব।

'সাক্ষাতকারে আপনি এইসব প্রতারণার কথা যে লিখবেন না, তা জানি। কিন্তু আমার দাবি আর একটু বেশি। আমি চাই আপনি কাগজের পাতায় আমার সঙ্গে এইসব কথাবার্তা নিয়ে কিছুই লিখবেন না।

ভুখোর খোঁজ-পিয়াসী সাংবাদিকের একজোড়া ধূসর চোখ স্পর্শ বুলিয়ে গেল প্যাটের মুখে। তারপর উত্তর ফুটলো মডের মুখে, আর উত্তরটা দিয়ে ফেলে ওর নিজের কাছেই যেন বিস্ময়ের সীমা রইল না, 'বেশ, এ লেখা কাগজে ছাপা হবে না। একটা লাইনও লিখব না আমি।'

'আমি আগেই জানতুম'—,প্যাটের ছোট্ট মন্তব্য।

ক্ষণিকের হতাশা মডের মনেঃ একটা ধন্যবাদও জানাল না প্যাট! পরের মুহূর্তেই ওঁর বুকে খুশির কূজনঃ আহ্, ভাগ্যিস ধন্যবাদ জানায়নি প্যাট! এই এক ঘণ্টায় ওদের মধ্যে সম্পর্কের একটা অন্যরকম বনেদ গড়ে তুলেছে প্যাট।

এক প্রচণ্ড কৌতূহলে আচ্ছন্ন হল মড।

'আগে থেকে কী করে অনুমান করলেন?' কৌতূহল ভাসে মডের চোখে।

মাথা নাড়ল প্যাট, 'তা জানি না। হয়ত ঠিক মতো বুঝিয়েই বলতে পারব না। তবে, আমি জানতুম, নিশ্চিত ভাবেই জানতুম। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, আপনার আর আমার সম্বন্ধে আমি অনেক কিছু জানি।'

'কিন্তু এই সাক্ষাতকারটা কাগজে ছাপতে দিলে অসুবিধেটা কী? আপনার ম্যানেজার তো ঠিক কথাই বলছিলেন, যে এ-সব লেখা লড়াইয়ের আগে ভীষণ ভালো বিজ্ঞাপনের কাজ করে।'

'জানি', ধীর কণ্ঠে উচ্চারণ করল প্যাট, 'কিন্তু ও-ভাবে আপনাকে আমি চিনতে চাই না। লেখাটা ছাপা হলে বেশ হৈ-চৈ পড়ে যাবে, তা-ও জানি কিন্তু পেশার

সূত্রে আপনাকে চেনার ইচ্ছে আমার নেই। আমাদের দুজনের আজকের এই কথাবার্তাকে আমি মনে রাখব একজন পুরুষ আর একজন নারীর মধ্যেকার অন্তরঙ্গ আলাপ হিসেবেই। আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারছেন কি না, জানি না। আমি কিন্তু আমার মনের ভাল লাগার কথাই বলছি। একজন পুরুষ আর একজন নারীর পরিচয়—আমার স্মৃতিতে আজকের দিনটা বেঁচে থাকবে এইভাবেই।'

প্যাটের চোখে এখনও সেই একই দৃষ্টি, সেই স্থির, চিরন্তন, সুস্পষ্ট দৃষ্টি,—যে দৃষ্টিতে কোন পুরুষ চোখ রাখে কোন নারীর দিকে। ঐ দৃষ্টির ছোঁয়া, ছন্দ এখন অনুভব করতে পারছে মড। যে যুবককে লোকে চেনে রুদ্ধবাক আর অপ্রতিভ বলে, তার সামনে দাঁড়িয়ে অসীম সাহসী, সপ্রতিভ মড স্যাংষ্টার নিজেই হয়ে পড়ছে রুদ্ধবাক, অপ্রতিভ। অনুভব করছে, আর পাঁচটা লোকের থেকে অনেক যথাযথ ভাবে কথা বলতে পারে এই যুবক, আর নিজের কথা অন্যদের বিশ্বাস করাতে পারার ক্ষমতাও এর অনেক বেশি। আরও একটা ব্যাপারে মড সম্পূর্ণ নিশ্চিত (ভাবতে ওর নিজেরই অবাক লাগছে) যে এই যুবক তৈরী করে কিম্বা সাজিয়ে-গুছিয়ে কোন কথা বলছে না, বলছে নিজের বুকের গভীর থেকে, অকপটে।

নিজেই দরজা খুলে মডকে গাড়িতে তুলে দিল প্যাট, বিদায় জানাল, আর ওর মুখে বিদায় শুনে আর একবার দেহে অন্তরে কেঁপে উঠল মড। শেষবারের মতো ওর হাতটা টেনে নিল প্যাট, বলল—'আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে আমার। আপনাকে আবার দেখতে চাই আমি। কেন যেন মনে হচ্ছে, আপনার আর আমার মধ্যে অনেক কথা বাকি আছে আর শেষ কথাটা এখনও বলা হয় নি।'

গাড়িতে একা একা যেতে যেতে একই কথা ঢেউ তুলল মডের বুকেও। না, মুষ্টিযোদ্ধাদের রাজা, দুর্বার বর্বর, এই অশান্ত প্যাট গ্লেগুনের সবটুকু এখনও জানা হয় নি ওর।

অনুশীলন চত্বরে ফিরে, উদ্বিগ্ন স্টুবনারের সঙ্গে দেখা হল গ্লেগুনের।

স্টুবনার ফুঁসে উঠলেন, 'আমাকে অমন করে ঘর থেকে বার করে দিলে কেন হঠাৎ? ওহ্, সব ডুবল এবার। ব্যাপারটা একেবারে তালগোল পাকিয়ে দিলে তুমি। এর আগে কোন সাংবাদিকের সঙ্গে একা একা কথা বলেছ কখনো? ওহ্, ঐ সাক্ষাতকারটা কাগজে ছাপা হলে কী যে কাণ্ডটা ঘটবে, কে জানে!'

খুব নিস্পৃহভাবে ম্যানেজারটিকে দেখছিল প্যাট। ম্যানেজারের কথা শেষ হতে,

চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল ও, তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

'ওটা কাগজে কোনদিনই ছাপা হবে না।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্যাটের দিকে তাকালেন স্টুবনার।

প্যাট স্থির, 'আমি ওকে বলেছি না লিখতে।'

ক্রোধে বিস্ফারিত হয়ে উঠলেন স্টুবনার, তারপর ঠোঁটের কোনে বিদ্রুপের হাসি ফুটিয়ে বলল 'এরকম একটা রসালো রসদ হাতে পেয়েও উনি ছেড়ে দেবেন ভেবেছো?'

প্যাটের গলা আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা আর কঠোর, আর তার ফাঁকে দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ, 'না, লেখাটা ছাপা হবে না। উনি আমাকে কথা দিয়েছেন ; এটা অস্বীকার করলে ওঁকে মিথ্যাবাদী বলা হয়।'

প্যাটের চোখে সেই আইরিশ আগুন, হাত নিজের অজান্তেই হাত মুষ্টিবদ্ধ। ঐ হাত, আর কব্জি যে কতটা জোর ধরে, স্টুবনারের তা অজানা নেই। সন্দেহপ্রকাশ করার আর সাহস পেলেন না তিনি।

লড়াইটাকে যে ষোল রাউণ্ডের বেশি টানতে চাইছে প্যাট, সেটা বুঝে নিতে বিশেষ দেরি হল না স্টুবনারের। কিন্তু অনেক অবান্তর কথা বলে হাজার চেষ্টা করেও জেনে উঠতে পারলেন না, ঠিক কোন্ রাউণ্ডে লড়াইটা শেষ করার কথা ভাবছে ও। তবে, সময় নষ্ট করা স্টুবনারের ধাতে নেই। প্যাট পাওয়ার্স আর তার ম্যানেজারের সঙ্গে গোপনে একটা বন্দোবস্ত করে ফেললেন চটপট। জুয়াড়িদের সঙ্গে প্যাট পাওয়ার্সের রীতিমত দহরম-মহরম আছে। তাছাড়া, জুয়াড়িদের সিণ্ডিকেটের কথাটাও তো ভাবতে হয়। লাভের গুড় যদি এসব ফালতু ঝুট ঝামেলায় নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সবাইকে মাথায় হাত দিয়ে বসতে হবে যে।

লড়াইয়ের রাত। লড়াইটা ভালভাবে দেখার জন্য মড স্ম্যাংস্টার মরিয়া। লোক জানাজানি হয়ে গেলে কেলেঙ্কারির একশেষ। সম্পাদকের শরীরের আড়ালে চুপচাপ হেঁটে এসে একেবারে রিং-এর ধারের একটা আসনে গিয়ে বসল ও। চওড়া কানাতওয়ালা নরম টুপিতে ঢাকা পড়ে গেছে সবটুকু চুল আর মুখের অনেকটাই। গায়ে চাপিয়েছে পুরুষদের লম্বা ওভারকোট, প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত নেমে এসেছে কোটটা। ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ার পর কারুর পক্ষেই ওকে চিনে ওঠা সম্ভবপর হলো না, এমনকি ওর ঠিক সামনে রিং-এর ধারে বসে থাকা অন্যান্য সাংবাদিক বা আলোকচিত্রীরাও চিনতে পারল না ওকে।

লড়াই শুরুর আগে গা গরম করার জন্য একটু ঘুষোঘুষি করে নেওয়ার রেওয়াজ এখন উঠে যাচ্ছে, এখন লড়াই শুরু হয়ে যায় রিং-এ ঢোকার পর থেকেই। নিজের আসনে তখনও বসেছে কি বসে নি, হঠাৎ উল্লাসে গর্জন করে উঠল দর্শকরা : প্যাট পাওয়ার্স হেঁটে আসছে ধীরে ধীরে। দু'সারি আসনের মাঝ দিয়ে হেঁটে এল গর্বিত প্যাট পাওয়ার্স, সঙ্গে তার সহকারীরা। বিশাল দানবের মতো চেহারা। এমনভাবে ওকে আসতে দেখেই বেশ ঘাবড়ে গেল মড। দড়ির নীচে দিয়ে এমনভাবে রিং-এ ঢুকল লোকটা যেন শরীরটা মোটেই খুব ভারী নয়। জনতার উদ্দাম উল্লাস আর কানফাটানো চিৎকার। একটা বিকৃত রুক্ষ হাসি ফুটে উঠল মুষ্টিযোদ্ধাটির বীভৎস মুখে। লোকটার মধ্যে কোথাও কোন সৌন্দর্যের ছাপ নেই। ছোট করে ছাঁটা চুল, বিশাল মাথার গায়ে করে বাঁধাকপি আকারের ঢাউস দুখানা কান যেন নিষ্ঠুরতার প্রতীক হয়ে উঁচিয়ে রয়েছে। নাকখানা ভাঙা, চেপ্টে চ্যাটালো হয়ে গেছে। কোন ডাক্তারের সাধ্য নেই ওটাকে মেরামত করে খাড়া করার।

আবার জনতার সমুদ্র গর্জন। আসছে, প্যাট গ্লেগুন আসছে এবার! মডের উৎসুক চোখ চেয়েছিল ওর আসার পথে। শান্ত ভাবে হেঁটে এসে দড়ি তুলে রিং-এ পা রাখল প্যাট। চলে গেল নিজের কোণে। অতঃপর কিছু গতানুগতিক

কাজঃ ঘোষণা, প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, চ্যালেঞ্জ জানানো। নিয়মরক্ষার পালা শেষ হওয়ার পর, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা খুলে ফেলল নিজেদের বহির্বাস, লড়াইয়ের পোশাকে সজ্জিত হয়ে পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়াল। ওদের মাথার ওপর অজস্র উজ্জ্বল বিজলী-বাতির ঝলক—সিনেমার লোকেদের ছবি তোলার জন্যেই এই ব্যবস্থা। মডের চোখের সামনে, রিং-এর মধ্যে, দুই যোদ্ধা, একেবারে পরস্পর-বিপরীত চেহারাও চরিত্রের দুটি মানুষ। গ্রেগুনের সমগ্র অস্তিত্বে ও খুঁজে পাচ্ছে এক মার্জিত, রুচিশীল ব্যক্তিত্ব, আর পাওয়ার্সের চেহারায় ফুটে উঠছে এক সত্যিকারের বর্বরের ছবি। গ্রেগুনের মুখেচোখে, বিশাল সুঠাম শরীরে ঝকঝকে পরিচ্ছন্নতা, কোমলতা আর শক্তিমত্তায় মেশানো আশ্চর্য সৌন্দর্য ওর সর্বাঙ্গে; অন্যদিকে পাওয়ারার্সের চেহারা বিশ্রীরকম রুক্ষ কঠিন, সারা শরীর ভাল্লুকের মতো লোমে ঢাকা।

ছবি তোলার জন্য লড়ার ভঙ্গীতে পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়াল ওরা। আর ঠিক তখনই, রিং-এর দড়ি-ঘেরা সীমানা টপকে, প্যাটের চোখ থমকে দাঁড়াল মডের মুখে। না, এতটুকুও ভাবান্তর খেলল না প্যাটের চোখে। তবু, মডের বুকের মধ্যে এক আকস্মিক উচ্ছ্বাস নিয়ে মড বুঝল—ঐ যুবকের চোখ তাকে চিনে নিতে মোটেই ভুল করে নি। পর-মুহূর্তেই ঘণ্টার শব্দ, এবং ঘোষকের চিৎকার—'স্টার্ট'!

শুরু হল লড়াই।

পরিচ্ছন্ন লড়াই। রক্তপাত নেই, ধাক্কাধাক্কি নেই। দুজনেই সতর্ক। প্রথম রাউণ্ডের অর্ধেকটা সময় জুড়ে দুজন শুধু পরস্পরকে যাচাই করার চেষ্টাই করে গেল। কিন্তু মড স্যাংস্টার—ওর চোখের সামনে এখন এক আশ্চর্য যুদ্ধ তার বিচিত্র কৌশল, দুই যোদ্ধার দস্তানায় ঠোকাঠুকির শব্দ—উত্তেজনা, একেবারে টানটান অবস্থা। পরের দিকের রাউণ্ডে যখন কখনও কখনও উপর্যুপরি বেশ কিছু কঠিন ঘুষির বিনিময় চলছিল তখন ওর প্রবল উত্তেজনা লক্ষ্য করে সম্পাদক মশাই ওর বাহু স্পর্শ করে মনে করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন যে ও কে এবং কোথায় বসে আছে।

বেশ সাবলীলভাবে লড়ে চলেছে প্যাট পাওয়ার্স। পঞ্চাশটা লড়াইয়ের বিজয়ী বীর সে, ভালো তো লড়বেই। ওর প্রত্যেকটা শারীরিক চলনে ও হস্ত চালানোর চাতুর্যে জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠছে অনুরাগীরা। তবে, উপর্যুপরি কিছু কঠিন ঘুষি বিনিময়ের সময়গুলো ছাড়া, নিজেকে অনর্থক মেলে ধরছে না ও। আর

ঐ-সব উত্তেজনাময় মুহূর্তে আসন থেকে ছিটকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে দর্শকরা, উদ্বেল অনুরাগীরা প্রচণ্ড চীৎকারে গ্রেগুনকে ছিঁড়ে ফেলতে বলছে। ভাবছে —পাওয়াসে'র প্রতিদ্বন্দ্বীটির আজ আর নিস্তার নেই।

ঠিক এইরকমই একটা মুহূর্ত। মডের অনভ্যস্ত চোখ ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, মনে হচ্ছে যেন কোন কঠিন আঘাত না হানার চেষ্টাটুকুই শুধু করে যাচ্ছে প্যাট। ওর ব্যাকুল চোখ রিং-এ ঘুরছে। ঠিক তখনই সম্পাদকটি ঝুঁকে পড়লেন ওর দিকে, চাপা গলায় বলে উঠলেন: ছোট প্যাট আজ জিতবেই। বাইরে থেকে এসেছে ও, শুনেছি নাকি জঙ্গলে বড় হয়েছে, ওকে রোখার সাধ্য এদের নেই। তবে দেখে নিও, পাওয়াস'কে ও আছড়ে ফেলবে ঠিক ষোল রাউণ্ডের মাথায়, তার আগে নয়।'

মডের ছোট্ট প্রশ্ন, 'নাকি তার পরে?'

সম্পাদক মাথা নাড়লেন—'না, ঠিক ষোল রাউণ্ডেই, পরেও নয় আগেও নয়।' মডের বুকে হাসির ঢেউ। এ প্রশ্নের উত্তর ওর থেকে ভালোভাবে আর কে জানে?

প্রত্যেক রাউণ্ডে, প্রতি মুহূর্তে প্রতিপক্ষকে অবিরত আক্রমণ করে যাওয়াটাই পাওয়াসে'র লড়াইয়ের ধরণ। গ্রেগুন ওকে সুযোগ দিয়ে যাচ্ছে। আত্মরক্ষার বুনোটে কোথাও ফাঁক নেই গ্রেগুনের, কোন গলদ নেই, একেবারে ঠাস জমাট। দর্শকদের উত্তেজনা জিইয়ে রাখার জন্য হাত চালাচ্ছে মাঝে-মাঝে, বুঝে-শুনে। পাওয়াস' মনে মনে জানে, হারতে তাকে হবেই। তবু, অভিজ্ঞতায় কিছু কম্‌তি নয় ও। ঠিকমতো ফাঁকতাল পেলে প্রতিপক্ষকে শুইয়ে দেওয়ার ও অনুরাগীদের হাততালি পাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করবে না সে। অতীতে এমন ঘটনা কয়েক বারই ঘটেছে। জুৎমতো মওকা পেলে চিৎ করে দাও প্রতিপক্ষকে, তারপর জুয়াড়িদের সিণ্ডিকেট লাটেই উঠুক আর জাহান্নামেই যাক। খবরের কাগজগুলো ক'দিন ধরে এমন একটা হাওয়া ছড়িয়েছে, যার দরুণ অনেকেই ভেবে নিয়েছে—যাক, এতদিনে ছোট প্যাট ঠিক একটা শক্ত লোকের হাত পড়েছে, এবার আর রেহাই নেই ওর! কিন্তু পাওয়াস' জানে, খুব ভালো করেই জানে; রেহাই তার নিজেরই নেই। খুব কাছু থেকে ঝটপট ঘুষোঘুষি চলার সময় বার কয়েকই ওর শরীরে এসে পড়েছে প্যাটের পাঞ্চ, তার ওজনটা অনুভব করেছে পাওয়াস', আর সেইসঙ্গে এটাও বুঝেছে- ঐ-সব পাঞ্চে যতটা জোর থাকার কথা, ততটা জোর ইচ্ছে করেই দিচ্ছে না প্রতিপক্ষ যোদ্ধাটি।

আব গ্রেগুন? মাঝে-মধ্যেই লড়াইটা এমন জায়গায় চলে যাচ্ছে, যেখানে হিসেবের এতটুকু ভুলচুক হলেই ওর মুখে আছড়ে পড়তে পারে পাওয়ার্সের লোহার হাতুড়ির মতো হাত, ছিটকে ফেলে দিতে পারে ওকে রিং-এর মেঝেতে। কিন্তু, নিজস্ব একটা সুরক্ষা দেওয়াল আছে প্যাটের, আছে সময় ও দূরত্বের নিখুঁত হিসেব! কয়েকবার পাওয়ার্সের ঘুষি বজ্রের মতো ছুটে গেছে ওর কান ঘেঁষে। তবু, আত্মবিশ্বাসে এতটুকু চিড় ধরে নি ওর। আজ পর্যন্ত কোন লড়াইতে হারে নি ও, একবারও ছিটকে পড়ে নি মেঝেয়। আসলে, যে-কোন লড়াইয়ের শুরু থেকেই যেন লড়াইটা বাঁধা থাকে ওর হাতের মুঠোয়। পরাজয়? প্যাট গ্রেগুন পরাস্ত? না, ভাবাও অসম্ভব সেটা।

পনের রাউণ্ডের লড়াই শেষ হল।

দুজনেই অক্ষত, এখনও। পাওয়ার্স শুধু একটু জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে, এই যা! রিং-এর ধারে বসা কোন কোন বিজ্ঞ দর্শক বলাবলি করছিল—এই রাউণ্ডে ও গ্রেগুনকে নির্ঘাৎ তুবড়ে দেবে!

ষোড়শ রাউণ্ড শুরু হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে পিছন থেকে প্যাটের পাশে ঝুঁকে পড়লেন স্টুবনার, চাপা গলায় জানান দিলেন, 'এই রাউণ্ডেই ফেলছে তোকে?' ঝট্‌ করে ঘাড় ফেরাল প্যাট, একটু ঝাঁকালো মাথাটা, আর ম্যানেজারের উদ্বিগ্ন মুখের ওপর ছড়িয়ে দিল এক ঝলক বিদ্রুপের হাসি।

ঘণ্টা পড়ল। ষোড়শ রাউণ্ড। বিস্মিত প্যাট লক্ষ্য করল, রাউণ্ডের শুরু থেকেই পাওয়ার্স যেন একেবারে মরিয়া। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল পাওয়ার্স। রিং-এর মধ্যে যেন ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাচ্ছে। আত্মরক্ষা করে চলেছে প্যাট, পাওয়ার্সের ঘুষি আটকাচ্ছে, আঁকড়ে ধরছে ওর হাত, মাথা নামিয়ে নিচ্ছে, কখনো ঝট্‌করে সরে যাচ্ছে এক পাশে, কখনো বা পিছু হটে একেবারে চলে যাচ্ছে দড়ির গায়ে। তারপর আবার রিং-এর মাঝখানে ফিরে আসা মাত্রই শুরু হচ্ছে পাওয়ার্সের নতুন আক্রমণের ঝড়। মাঝে মধ্যে পাল্টা মার দেওয়ার সুযোগও এসে যাচ্ছে প্যাটের, ফাঁক দেখা যাচ্ছে পাওয়ার্সের রক্ষণে। কিন্তু হাত চালাচ্ছে না প্যাট। না, এখনই প্রতিদ্বন্দ্বীকে আছড়ে ফেলতে রাজি নয় ও। আরও দুটো রাউণ্ড, তারপর ··· ! গোটা লড়াইটাতে একবারও ও নিজের পুরো শক্তিটুকু কাজে লাগায় নি, একটা ঘুষিতেও মিশিয়ে দেয়নি নিজের সবটুকু শক্তি।

টানা দু' মিনিট আক্রমণের ঝড় তুলে গেল পাওয়ার্স, একটু দম নেওয়ারও

অবসর দিল না প্রতিপক্ষকে। আর ঠিক এক মিনিট। তারপরই রাউণ্ড শেষ। সর্বনাশ হয়ে যাবে জুয়াড়িদের সিণ্ডিকেটের। কিন্তু…না, ঐ একটা মিনিটের নসিবে অন্য কিছু লেখা ছিল। রিং এর মাঝখানে যুযুধান দুই মুষ্টিযোদ্ধা। আব পাঁচটা লড়াইয়ের মতোই জড়াজড়ির মধ্যে পড়ে গেছে দুজনে। ওরই মধ্যে হাত চালানোর চেষ্টা করছে পাওয়ার্স। আর ঠিক তখনই…

আর ঠিক তখনই বাঁ হাতটা তুলে পাওয়ার্সের মুখের এক পাশে আঘাত করল প্যাট। নেহাতই মামুলি একটা ঘুষি। এই লড়াইতেই অন্তত বার কুড়িক এ-রকম আঘাত হেনেছে ও। কিন্তু, অবাক বিস্ময়ে প্যাট দেখল—কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে যাচ্ছে পাওয়ার্স, পা দুটোয় যেন জোর নেই এতটুকু, আস্তে আস্তে সে ঢলে পড়ছে মেঝের ওপর !

তারপর দড়াম করে মেঝের ওপর সশব্দে পড়ে গেল পাওয়ার্স, গড়িয়ে গেল কিছুটা, পড়ে রইল চুপচাপ—নিথর, নিঃস্পন্দ।

ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে গুনতে শুরু করলেন রেফারি – এক…দুই… পাঁচ… সাত… নয়… ! একটু যেন কেঁপে উঠল পাওয়ার্স, উঠে দাঁড়ানোর জন্য চেষ্টা করছে প্রাণ-পণে, কিন্তু পারছে না।

দশ ! আউট !

প্যাটের হাতটা উঁচুতে তুলে ধরলেন রেফারি, বাতাস কেটে ভেসে এল দর্শকদের আকাশ ফাটানো উল্লাসধ্বনি। প্যাট গ্লেগুন বিজয়ী !

নিজের বক্সিং-জীবনে আজ, এই প্রথম, প্যাট বিমূঢ়, বিভ্রান্ত। নক-আউট করার মতো তো জোর ছিল না ঘুষিটায় ! হ্যাঁ, জীবন বাজি রেখে কথাটা বলতে পারে ও। তাছাড়া, ঘুষিটা ঠিক পাওয়ার্সের চোয়ালেও মারে নি, মেরেছিল মুখের এক পাশে। তবু…পড়ে গেল লোকটা, দশ গোনা পর্যন্ত উঠতে পারল না ! তাহলে আসল ব্যাপারটা কি ! অভিনয়, ওহ্, কী নিখুঁত অসাধারণ অভিনয় ! মেঝের ওপর ওভাবে দড়াম করে পড়ে যাওয়াটা তো অসাধারণ। দর্শকরা বুঝে গেল—পরিষ্কার নক-আউট হয়েছে প্যাট পাওয়ার্স। সিনেমার লোকেদের ক্যামেরাতেও সে ছবিই ধরা রইল। জুয়ারীদের সিণ্ডিকেটই সফল হলো তাহলে, মডের সেই সম্পাদকও জিতলেন শেষ পর্যন্ত।

গ্লেগুনের চকিত দৃষ্টি খুঁজে নিল মড স্যাংস্টারকে। ওর দিকেই চেয়ে আছে মড, দেখছে—নিস্পলক ঠাণ্ডা, কঠিন চাউনি। যেন প্যাটকে আদৌ চেনে না ও, দেখে নি কোনদিন। প্যাটের ব্যগ্র দৃষ্টি উপেক্ষা করে মুখ ফেরাল ও, পাশের লোকটাকে

নিচুস্বরে কি-যেন বলল।

সহকারীরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে পাওয়ার্সকে! নিথর শরীর, হাত-পা ঝুলিয়ে শুয়ে রয়েছে পাওয়ার্স, যেন এক বিধ্বস্ত মানুষ। প্যাটের সহকারীরাও এগিয়ে আসছে অভিনন্দন জানাতে, বিজয়ী বীরের হাত থেকে দস্তানাজোড়া খুলে নিতে। একেবারে সামনে স্টুবনার, চোখে-মুখে ফুটে-ওঠা খুশি। প্যাটের ডান হাতটা চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলেন স্টুবনার: 'সাবাশ প্যাট! আমি জানতুম, বাজিমাৎ তুমি করবেই।'

হাতটা টেনে নিল প্যাট। আর, এই প্রথম, ওকে দিব্যি উচ্চারণ করতে শুনলেন স্টুবনার: 'জাহান্নমে যাও তুমি', বলতে বলতে দস্তানাজোড়া খোলার জন্য সহকারীদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল প্যাট।

লড়াই দেখে বেরিয়ে, কুরিয়ের জার্নাল-এর সম্পাদকটি মড স্যাংস্টারকে বুঝিয়ে ছাড়ল—দেখলেতো একজন মুষ্টিযোদ্ধাও দুর্নীতিমুক্ত বা সৎ নয়!

সেই রাতে, সেই বিষণ্ণ, কিছু-একটা-হারানো রাতে, একলা বিছানায়, মডের ঘুম-না-আসা দু'চোখের কোল জুড়ে জমে উঠল কিছু মুক্তোদানার মতো অশ্রুকণা, গড়িয়ে পড়ল বালিসের বুকে। অনেক বেদনার অশ্রুধারায় সিক্ত হল ওর সঙ্গীহীন শয্যা। এক অদ্ভুত অস্থিরতা গ্রাস করল ওকে। তারপর, গভীর ব্যথা বেদনার অন্তর থেকে উঠে এল এক খণ্ড ক্রোধ। অনেকটা বিনিদ্র রাত খরচ করে, নিজের ওপর, মুষ্টিযোদ্ধাদের ওপর আর সারা পৃথিবীটার ওপর অবিশ্বাস ও চূড়ান্ত বিতৃষ্ণায় তলিয়ে যেতে যেতে, ঘুমিয়ে পড়ল মড!

পরের দিন বিকালে অফিসে নিজের ঘরে চুপচাপ হেনরি অ্যাডিসনের একটা সাক্ষাতকার মাজাঘষা করতে বসল ও। লেখাটা পড়ে আছে বহুদিন ধরে, শেষ আর করা হচ্ছে না। কুরিয়ের জার্নাল-এর অফিসে তখন লোকজন বেশী নেই. একা কাজ করছিল মড। ঘটনাটা তখনই ঘটল। কাজ করতে মন লাগছে না, বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে, লেখা থামিয়ে কাগজের সান্ধ্য সংস্করণটায় একটু চোখ বোলাচ্ছে। হঠাৎ এক জায়গায় ওর চোখটা আটকে গেল। মড পড়ল—প্যাট গ্লেগুনের পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী টম ক্যান্নাম। আর ঠিক তখনই একজন বেয়ারা ঘরে ঢুকল, হাতে তার একখানা কার্ড!

প্যাট গ্লেগুনের কার্ড!

'বলে দাও দেখা হবে না', মডের গলা কঠিন।

চলে গেল বেয়ারাটি, কিন্তু ফিরে আসতেও দেরি হল না তার।

'উনি বললেন, ভেতরে আসবেনই, খুব দরকার। তবে আপনার অনুমতি পেলে ভালো হয়।'

মড শুধোল, 'আমি যে এখন ব্যস্ত আছি, সেটা বলেছিলে?'

'বলেছিলুম তো। কিন্তু বললেন, খুব জরুরী দরকার, উনি আসবেনই।'

মড নির্বাক। বেয়ারাটির চোখে কিন্তু ঐ নাছোড়বান্দা আগন্তুকের প্রতি শ্রদ্ধার ঝিকমিকে দীপ্তি।

'ম্যাডাম ওনাকে আমি চিনি। বিরাট চেহারা আর সাঙ্ঘাতিক লোক!' রেগে একবার হাত চালাতে শুরু করলে গোটা অফিসটা ভেঙ্গে চুড়ে ফাঁকা করে দিতে পারেন, একজনকেও আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। বাপরে বাপ, ওঁর নাম ছোট গ্রেগুন! দৈত্যের মতো চেহারা, কিন্তু কি চমৎকার দেখতে, কাল রাত্তিরে উনিইতো লড়াইতে জিতেছেন।'

'বেশ, তাহলে পাঠিয়ে দাও। অফিসটা যদি ফাঁকা টাকা হয়ে যায় তাহলে বেজায় মুস্কিলে পড়ে যেতে হবে!'

একটু পরেই ঘরে পা রাখল প্যাট। কথাহীন নিস্তব্ধ।

কোন সৌজন্য বা শুভেচ্ছা-বিনিময় নয়। মডও নির্বাক, উচ্ছ্বাসহীন। প্যাটকে বসতেও বলল না ও। চোখেও যেন অপরিচয়ের মেঘ। ডেস্কে পাশ ফিরে বসে হাতের কাগজ পত্রে মুখ ডুবিয়ে রয়েছে, অপেক্ষা করছে প্যাটের কথা শোনার জন্য।

এই নিরুত্তাপ আচরণের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না প্যাটের মুখে। সরাসরি কাজের কথা শুরু করল সে।

'আপনাকে আমাব কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি। কালকের লড়াইটার কথা দিয়েই শুরু করছি। লড়াইটা পূর্ব নির্দিষ্ট রাউণ্ডেই শেষ হয়েছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল মড, 'একথাতো আমার জানাই ছিল।'

'না, পুরোটা জানা ছিল না আপনার। জানা ছিল না আমারও।'

ঘুরে বসল মড, বিরক্ত চোখে তাকাল প্যাটের দিকে, 'এ-সব কথা বলে এখন আর কী লাভ? প্রাইজ-ফাইটিং-এর অর্থটা আমাদের সকলেরই তো বিশদ ভাবে জানা আছে। লড়াইটা যে রাউণ্ডে শেষ হবে বলে আপনাকে জানিয়েছিলাম ঠিক সেই রাউণ্ডেই শেষ হয়েছে, ব্যস কথা শেষ।'

'হ্যাঁ, তা হয়েছে। কিন্তু আপনি তো জানতেন লড়াইটা ঐ রাউণ্ডে শেষ হবে না। সারা দুনিয়ায় অন্তত আমরা এই দুজন তো জানতুম—ষোল রাউণ্ডে পাওয়ার্স নক-আউট হচ্ছে না।'

মড নিরুত্তর।

প্যাট অস্থির, 'আমি বলছি, আপনি জানতেন কিনা ন্যাট পাওয়ার্স ষোল রাউণ্ডে নক-আউট হচ্ছে না।'

মড নিরুত্তর।

অস্থির প্যাট চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেল ওর খুব কাছে, 'উত্তর দিন।'

মাথা নাড়ল মড, 'কিন্তু তা-ই তো শেষ পর্যন্ত হয়েছে।'

'না, হয় নি। ও আদৌ নক-আউট হয় নি। বুঝতে পারছেন? মন দিয়ে শুনুন আমার কথাটা। আমার কথাটা হয়ত একটু রূঢ় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনার কাছে যে আমি কখনই মিথ্যে বলতে পারি না, বুঝতে পারছেন? আপনার কাছে আমি কোনদিন মিথ্যে বলতে পারব না। নেহাতই বোকা আমি। ওরা সবাই মিলে আমাকে বোকা বানিয়েছে, আর সেই সঙ্গে আপনাকেও। আপনি ভেবে-ছিলেন পাওয়ার্স নক-আউট হয়ে গেছে। কিন্তু আমি সেরকম জোরে ওকে ঘুষি মারিনি। এমনকি ঠিক জায়গায় লাগেও নি ঘুষিটা, চোয়াল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে। অথচ ও এমন ভাব দেখাল যেন কত জোরেই না লেগেছে। গোটা ব্যাপারটাই মিথ্যে—মিথ্যে—মিথ্যে—,একেবারে সাজানো একটা চমৎকার অভিনয়। নক-আউট ও মোটেই হয় নি।'

থামল প্যাট, প্রত্যাশাভরা সেই উজ্জ্বল নিষ্পাপ চোখে তাকাল মডের দিকে। সেই স্বচ্ছ দৃষ্টির ছোঁয়ায় মডের বুকে দোলা দিয়ে ওঠে এক আকস্মিক উচ্ছ্বাস, আনে স্বস্তি! প্যাটের কথাকে এখন আর এতটুকুও অবিশ্বাস করতে পারছে না ও। এই যুবক, যে তার কেউ নয়, যাকে সে জীবনে মাত্র দুবার দেখেছে, তাকে আবার সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করতে পেরে যেন এক অজানা সুখের বাঁধভাঙা বানে ওর দেহ মন সব আপ্লুত হয়ে যাচ্ছে।

'বলুন, আপনি বিশ্বাস করেছেন।' প্যাটের গলায় দাবি। সেই আশ্চর্য নমনীয় অথচ কঠিন দাবির সুর আরেকবার কাঁপিয়ে দিল মডকে।

উঠে দাঁড়াল মড, কেমন যেন একটা মোহময় ঘোরের মধ্য দিয়ে ও জড়িয়ে ধরল প্যাটের হাত, 'আপনার কথা। হ্যাঁ, আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছি! খুশি হয়েছি, খুব খুশি হয়েছি আমি।'

চোখ তুলে প্যাটের গভীর নীলিমায় ঘেরা শান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠে মুখ নীচু করে মড।

দুটো হাত পরস্পরকে আঁকড়ে রইল অনেকক্ষণ।

জ্বলজ্বলে, উদ্ভাসিত চোখে মডের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রয়েছে প্যাট। এবার আবেগে আরক্ত মুখ তুলে আর চোখ ফেরাতে পারছে না মডও। ওর মনের নিভৃতে ভাবনার গুঞ্জন: এরকম কোন নিষ্পাপ সরল অথচ ক্ষিপ্র কঠিন পুরুষের এর আগে সাথে কখনও দেখা হয় নি! এক সময় চোখ নামাল মড, দেখাদেখি প্যাটও, তারপর দুজনের দৃষ্টিই স্থির হয়ে রইল নিজেদের বাঁধা-পড়া

হাতদুটোর দিকে।

একটু এগিয়ে এল প্যাট, যন্ত্রচালিতের মতো, যেন দু'হাতের নিবিড় বাঁধনে ঘিরে রাখতে চায় এই মোহময় কোমল পলকা শরীরের নারীকে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিল নিজেকে, আপ্রাণ চেষ্টায়।

ওর আবেগটুকু আঙুলের স্পর্শের মধ্য দিয়ে অনুভব করতে অসুবিধে হল না মডের। আর ঐ যুবকের হাত ওকে প্রবল আকর্ষণ করছে, যেন আশ্রয় দিতে চাইছে বিশাল বুকের প্রশস্ত জমিতে। আশ্চর্য, মডও যেন সমস্ত তনু মন দিয়ে চাইছে ধরা দিতে, বাঁধা পড়তে, ঐ দুটো বলিষ্ঠ হাতের বৃত্তে সঁপে দিতে নিজেকে! প্যাট যদি ওকে সত্যিই টেনে নেয়—তাহলে নিজেকে সংযত করার মতো কোনই জোর খুঁজে পাচ্ছে না মড। নিঃস্পন্দ, বিহ্বল বিবশ। আপন শরীরের উপর যেন দখল নেই মডের। ঠিক তখনই নিজেকে সামলে নিল প্যাট, একবার চাপ দিল মডের হাতে (আর একটু জোরে হলে হাতটা ভেঙেই যেত), তারপর ছেড়ে দিল হাতটা। গভীর নিশ্বাস ফেলে উচ্চারণ করল, 'তুমি—তুমি আমার জন্যই জন্মেছো!'

একটু ঘুরে দাঁড়াল প্যাট, ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগল বিন্দু বিন্দু স্বেদজমা কপালে।

ও যদি একবারও ক্ষমা চাইত কি ওর আচরণের কোন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করত, তাহলে, মড জানে, প্যাটকে সে ঘৃণাই করে যেত জীবনভোর। কিন্তু ওর সঙ্গে আচরণে কখনোই যেন কিছু ভুল করে না প্যাট! এবার নিজের চেয়ারে এসে বসল মড। একটা চেয়ার নিজেই টেনে আনল প্যাট। ডেস্কের উল্টোদিকে চেয়ারটা রেখে, বসল মডের মুখোমুখী।

কথা বলতে শুরু করল প্যাট, 'কাল তুমি ভুল বুঝবে মনে করে ভীষন কষ্টে ছিলাম,সারা রাত উষ্ণ বাষ্পস্নান করে কাটিয়েছি। একজন বৃদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধাকে খবর পাঠিয়েছিলুম। উনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। বক্সিং জগতের কোন কিছুই যে ওঁর অজানা নয়, তা আমি জানতুম। ওনার কাছ থেকে সবকিছু শুনেছি ও জেনেছি। তবে, আমি যে ও-সব সম্বন্ধে সত্যিই কিছু জানি না, এটা বোঝাতে ওকে একেবারে হিমশিম খেয়ে গেছি। উনি আমাকে বুনো ষাঁড় বলে সম্বোধন করলেন। ঠিকই বলেছেন। জঙ্গলের মধ্যেই আমি বড় হয়ে উঠেছি, মানুষজনের সাথে আমি খুবই কম মিশেছি, আর শহরে তো এর আগে আসিই নি। খোলা প্রকৃতি জঙ্গলকেই আমি ছোট থেকে জানি, বুঝি।

'তো, কাল রাতে ঐ বৃদ্ধের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি তুমি যতটা বলেছিলে, তার থেকেও অনেক খারাপ এই বক্সিং জগতটা। এর সঙ্গে যুক্ত প্রায় প্রত্যেকটা লোকই জোচ্চোর। যে-সব সুপারভাইজার এসব লড়াই মঞ্জুর করে, তারা প্রোমোটারদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে। আবার এইসব প্রোমোটার, ম্যানেজার আর মুষ্টিযোদ্ধারা একে অপরের কাছ থেকে নানাসূত্রে টাকা কামায়, আর সবাই দর্শকদের ঠকিয়ে পকেট ভরায়। গোটা ব্যবস্থাপনাটাই এইরকম হয়ে উঠেছে। আবার—আচ্ছা, তুমি পরস্পরকে ঠকানো কাকে বলে, জানো? (মড ঘাড় নাড়ল—জানে।) সুযোগ পেলে এরা পরস্পরকে ঠকাতে এতটুকু ইতস্তত করে না।

'বৃদ্ধের কথা শুনে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। এই জগতেই আমি বেশ কয়েক বছর বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছি, অথচ এর অন্ধিসন্ধি কিছুই আমার জানা ছিল না। হ্যা—সত্যিই আমি একটা জংলী বুনো ষাঁড়ই ছিলুম। এখন বুঝতে পারছি কিভাবে ওরা আমাকে ঠকিয়েছে। আসলে আমাকে ঠকানোর সাধ্য কারুর নেই, লড়তে নামলে আমি জিতবই। আর এই সুযোগে লড়াই সম্বন্ধে আমার নিস্পৃহতার জন্য সমস্ত জাল-জোচ্চুরির ব্যাপারগুলো আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন স্টুবনার, কিচ্ছু জানতে দেন নি। আজ সকালে স্পাইডার ওয়াল্‌শ্‌কে চেপে ধরে অনেক কিছু জেনেছি। উনিই ছিলেন আমার প্রথম ট্রেনার। স্টুবনারের নির্দেশ মতোই চলতেন ওয়াল্‌শ্‌। আমাকে কোন কথা জানতে দেয়নি ওরা দুজনে। তাছাড়া, বক্সিং জগতের অন্যান্য লোকজনের সঙ্গেও তো আমার মেলামেশা ছিল না। অবসর সময়টা কাটাতুম শিকার করে, মাছ ধরে আর ছবি তুলে। ঐ ওয়াল্‌শ্‌ আর স্টুবনার নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় আমাকে কী নামে ডাকত জানো? কুমারী! কথাটা আজই সকালে ওয়াল্‌শের মুখে শুনলুম। শুনেই যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল মাথায়। তবু, কথাটা খুব মিথ্যে নয়। আমি সত্যিই একটা নিষ্পাপ শিশুর মতোই ছিলাম।

'নিজের জাল জোচ্চুরির স্বার্থে আমাকে কাজে লাগাচ্ছিলেন স্টুবনার, অথচ আশ্চর্য আমি তার বিন্দুবিসর্গও জানতুম না। এখন ভাবতে বসলে গোটা ব্যাপারটা ছবির মতো আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো, আসলে আমি এইসব লড়াই-টড়াইতে খুব একটা উৎসাহ পাই না। ফলে ওকে সন্দেহ করার কথাটা মাথায় আসেই নি। জন্ম থেকেই আমি প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়েছি, একটা বলিষ্ঠ শরীর আর ঠাণ্ডা মেজাজ পেয়েছি। বড় হয়ে

উঠেছি খোলা আকাশের নীচে, উচ্ছল ঝর্ণার পাশে, ঘন নীলিমায় ঘেরা পাহাড় জঙ্গলের মাঝে আর লড়তে শিখেছি আমার বাবার কাছে। জানো তো, বক্সিংটা আমার বাবার থেকে বেশি বোঝে, এমন কোন লোক পৃথিবীতে কোনদিন ছিল না, আর আজও নেই। ফলে, গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতো সহজ ছিল। বক্সিং নিয়ে আমাকে খুব একটা মাথা ঘামাতে হত না। সব সময়ই জানতুম—আমি জিতবই। কিন্তু আর নয়। আর আমি রিং-এ নামছি না।'

খবরের কাগজের হেডিংটার দিকে আঙুল দেখাল মড, যেখানে প্যাট গ্রেগুনের সঙ্গে টম কন্যামের আগামী লড়াইয়ের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

প্যাট জানাল, 'ওটা স্টুবনারের কীর্তি। মাসখানেক আগে এই লড়াইটার ব্যাপারে পাকা কথা হয়েছিল। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি এই নোংরা শহর থেকে আমার সেই পাহাড়ে ফিরে যাচ্ছি। যাওয়ার জন্যে বেরিয়েই পড়েছি আমি, আর ফিরছি না ওদের কাছে।'

ডেস্কের ওপরে পড়ে থাকা অসমাপ্ত সাক্ষাতকারটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মড।

'সত্যিই, পুরুষরা কত সুখী। নিজেদের ভাগ্য তারা নিজেরাই কত সহজে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। যা-খুশি তাই করতে পারে—'

ওর কথার মাঝপথে বাধা দিল প্যাট, 'কিন্তু আমি তো শুনেছি তুমিও নিজের খুশি মতো অনেক কিছুই করেছ। শুনে খুব ভারি ভালো লেগেছে আমার। আর এই জন্যই বোধহয় প্রথম থেকেই তুমি আর আমি পরস্পরকে যেভাবে বুঝতে পেরেছি, সেটা সত্যিই একটা আশ্চর্যের ব্যাপার।'

থামল প্যাট। ওর আলো জ্বলা স্থির চোখ মডের মুখে নিবদ্ধ।

তারপর, সময় কিছু খরচ করে, প্যাট বলে উঠল, 'তবে বক্সিং আমার একটা উপকার করেছে—তোমার সঙ্গে পরিচয়টা করিয়ে দিয়েছে। আর, পুরুষ যখন জীবনে তার নিজস্ব নারীকে খুঁজে পায়, তখন একটা কাজই শুধু তার করার থাকে: দু'হাতের বাঁধনে শক্ত করে বেঁধে নিতে হয় সেই নারীকে, কিছুতেই তাকে আর হারানো চলে না। চলো, তাহলে পাহাড়ে যাওয়ার জন্য রওনা হওয়া যাক।'

বজ্রপাতের মতো আচমকা চারদিক আলোকিত করা এক প্রস্তাব। আহ্, আশ্চর্য তীব্র এক আহ্বান। অথচ, অভাবিত নয়, অপ্রত্যাশিত নয়। মড যেন মনে মনে

প্রতীক্ষায় ছিল এই আহ্বানের। ওর বুকে এখন লক্ষ ঘোড়ার পদধ্বনি, এক আশ্চর্য প্রাপ্তির আনন্দে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধপ্রায়, খোলা চোখ মেলে চেয়ে থাকে প্যাটের দিকে। এক আদিম, সরল যুবক ডাক দিচ্ছে ওকে! তবু···তবু, সব যেন কেমন এক ছায়া-ছোঁয়া স্বপ্নের রেশ! কোন কেতাদুরস্ত সংবাদপত্রের অফিসে কি এ-রকম ঘটনা ঘটে, কখনও? প্রেম কি কখনো বন্ধ অফিসঘরে এভাবে ডানা মেলে? এরকম ঘটনা শুধুতো অভিনয়ের মঞ্চে আর উপন্যাসেই দেখা যায়। উঠে দাঁড়িয়েছে প্যাট, বলিষ্ঠ দুটো হাত বাড়িয়ে ডাক দিচ্ছে মডকে।

'আমি সাহস পাচ্ছি না, সাহস পাচ্ছি না',– মডের স্বর অর্ধস্ফুট, যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে সে।

চকিতে একটুকরো ক্রোধ লাফিয়ে উঠল প্যাটের চোখে, পরের মুহূর্তেই ফুটে উঠল স্পষ্ট অবিশ্বাস, 'আমি জানি, যা চাও তার জন্যে সাহসী হওয়াটা তোমার কাছে কোন কঠিন ব্যাপার নয়। প্রশ্নটা আসলে সাহসের নয়, চাওয়ার। তুমি চাও কি না?'

উঠে দাঁড়িয়েছে মড, যেন কোন স্বপ্নের দোলাচলে আন্দোলিত ওর সমগ্র সত্তা। সম্মোহন? চারপাশের জিনিসগুলোর দিকে তাকাতে চাইল মড, যেন বুঝতে চাইল ও এখন সত্যিই বাস্তবের জমিতে দাঁড়িয়ে আছে কি না। এই অফিস, শহর, ওর বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সত্তা সব কিছু ধরে টান দিয়েছে প্যাট। ও চোখ ফেরাতে পারছে না, ওর চোখ কোনমতোই সরতে পারছে না প্যাটের চোখের টান কাটিয়ে। কথা বলার শক্তিটুকুও যেন খুঁজে পাচ্ছে না ও।

মডের পাশে এসে দাঁড়াল প্যাট, হাত রাখল ওর বাহুতে। মড, বুঝি কোন অমোঘ আকর্ষণে ঝুঁকে পড়ল ওর দিকে। সব—স-ব যেন কোন এক আশ্চর্য স্বপ্নের খণ্ডদৃশ্য! আর কোন প্রশ্ন, কোন জিজ্ঞাসা নেই মডের। প্যাটের বিশাল চওড়া বুকের দিকে তাকিয়ে নিজের বুকের মধ্যে সাহস খুঁজে পাচ্ছে ও। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে প্যাট—যা চায়, তার জন্য সাহস অর্জন করাটা ওর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। চাইছে, মড সমস্ত অন্তর দিয়ে চাইছে! প্যাটের সাহায্যে জ্যাকেটটা পরে নিল ও, চুলে আটকে নিল হ্যাট-পিনগুলো। তারপর, আশ্চর্য এক-স্বপ্নিল ঘোরের মধ্যে বুঁদ-ডুব হয়ে এগিয়ে চলল প্যাটের সঙ্গে, পাশাপাশি। 'ডাচেসের যাত্রা' আর 'প্রতিমূর্তি ও আবক্ষমূর্তির' কথাগুলো মনে পড়ল ওর, আর মনে পড়ল 'সজাগ থাকা'র কথা। আনমনে যেন স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে উচ্চারণ করল মড, 'তাহলে সজাগ থাকা-র কী হবে?'

প্যাটের প্রত্যুত্তর, ডাঙ্গা পথে নাকি জলপথে যাবে?

উত্তরে কোন ভুল নেই। মডের মনে হল, উচ্চারিত এই কথাগুলো যেন ওর নিজের পাগলামির প্রমাণ স্বরূপ।

অফিসের বাইরে এসে হাত তুলে একটা ট্যাক্সি ডাকতে যাচ্ছিল প্যাট, কিন্তু বাহুতে মডের আঙুলের ছোঁয়া পেয়ে থামতে হল ওকে।

'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?' মডের গলায় প্রায়-ফিসফিস উচ্চারণ।

'ফেরীঘাটে। স্যাক্রামেণ্টোর ট্রেন ধরতে হলে এক্ষুনি লঞ্চে চড়তে হবে।'

'কিন্তু এভাবে আমি যাই কী করে? আমার···আমার সঙ্গে একটা বাড়তি রুমাল পর্যন্ত নেই!'

ট্যাক্সি ডাকার জন্যে আবার হাতটা তুলে প্যাট জবাব দিল, 'স্যাক্রামেণ্টোয় কেনাকাটা সেরে নিও। ওখানেই বিয়েটাও সেরে নেওয়া যাবে, তারপর রাতের ট্রেনটা ধরে নেব। ভাবনার কিছু নেই, ট্রেন থেকে টেলিগ্রাফ করে সব বন্দোবস্তই করে রাখা যাবে।'

ট্যাক্সিটা ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছে। চারদিকে একবার চোখ বোলাল মড—এই রাস্তার সঙ্গে ওর কতদিনের পরিচয়, এই শহর, পরিবেশ, এইসব মানুষ ওর কত চেনা, কত জানা। এখান থেকেই জীবনরস সংগ্রহ করে বড় হয়েছে ও। সহসা, সচকিতে, প্যাটের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল ও, 'কিন্তু তোমার···সম্বন্ধে যে আমি কিছুই জানি না!'

প্যাটের গলায় প্রত্যয়, 'কেন আমরা তো পরস্পরের সম্বন্ধে সবকিছুই জানি!'

মডের বাহুতে হাত রাখল প্যাট, গাড়িতে উঠতে সাহায্য করল ওকে। তারপর উঠল নিজে, বন্ধ হয়ে গেল ট্যাক্সির দরজা। এখন, পাশাপাশি ওরা দুজন। ট্যাক্সি ছুটে চলেছে মার্কেট স্ট্রীট ধরে। হাত বাড়িয়ে মডকে জড়িয়ে ধরল প্যাট, টেনে নিল নিজের কাছে, চুম্বন রাখল ওর ঠোঁটে। প্যাটের মুখের দিকে তাকাল মড, দেখল—সে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে লজ্জার রক্ত-আভা।

যে প্যাট বলল, আমি···শুনেছি, চুমু খাওয়াটা একটা শিল্প। কিন্তু সে-সব তো আমি জানি না, তবে শিখে নেব ঠিক। জীবনে তোমার আগে আর কোন মেয়েকে চুমু খাইনি আমি।'

স্ববিস্তীর্ণ কুমারী অরণ্য, তার মাঝে এক সূচীমুখ বিশাল পাথুরে টিলা, আর সেই টিলার ওপর পাশাপাশি শুয়ে আছে দুটি মানুষ : একজন পুরুষ, অপরজন নারী। নিচে গাছের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে দুটো ঘোড়া। দুটো ঘোড়ারই জিনের নিচে এক জোড়া ছোট ছোট থলি। চারপাশে বিশাল বিশাল গাছগুলো যেন শির উঁচিয়ে আকাশ ছুঁতে চাইছে! গুঁড়ির ঘের? তা, আট-দশ-বার ফুট করে তো হবেই। কোন কোনটা আরও বড়। গাছের গুঁড়িতে সবুজ শোওলার আস্তরন। এই গহন বনভূমির পায়ে-চলা পথরেখা ধরে ওরা দুজন ঘুরে বেড়িয়েছে সমস্ত সকাল জুড়ে। অবশেষে, এই প্রথম থেমেছে ওরা, বসেছে এসে টিলায়, চোখ মেলে দেখছে এই আশ্চর্য কুমারী অরণ্যকে।

চারপাশে, দূরে দূরে, যতটুকু ধরা দেয় চোখের জমিনে, পাহাড়ের সারি, একের পর এক, ঢেউ জাগানো, বড আবছা, কুয়াশা-ঘেরা, ময়ূরপঙ্খীরঙা। শেষ নেই, সীমা নেই। একটা পাহাড়, তার পিছনে আরেকটা, তার পিছনে আরও একটা.... সেই ধূসর, কত-না-দূর দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত এই শৈল-কল্লোল! দূর থেকে মনে হয়—ওখানেও বুঝি শেষ নয়, আরও, আরও দূর কোন অজানা মহাদেশের বুক জুড়েও যেন ছড়িয়ে পড়েছে ঐ পর্বতশ্রেণী। আর অরণ্য। ঘন, গহন বনভূমি। উত্তরে দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে—মাটির সবটুকু জুড়ে এক অনাহত, কুমারী বনভূমি।

ওরা দুজন শুয়ে আছে পাথুরে শয্যায়, চোখের মণিতে ভরে নিচ্ছে এইসব আশ্চর্য সুন্দর ছবি। পুরুষটির হাতে হাত রেখেছে নারীটি। এখানে ওদের মধুচন্দ্রিমা, এই মেন্দোকিনোর গভীর নির্জন বনভূমিতে। ওরা এসেছে শাস্তা পেরিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে, উপকূলের অরণ্যানীর মাঝ দিয়ে উজিয়ে এসে পৌঁছেছে এই বনাঞ্চলে। যতক্ষণ না মাথার মধ্যে অন্য কোন ভাবনার উদয় হয়, ততক্ষণ এভাবেই এগিয়ে চলার ইচ্ছে ওদের। পোশাকের হাল তথৈবচ। মেয়েটির পরণে লাট-খাওয়া খাকি পোশাক, ছেলেটি পরে আছে ওভারঅল আর পশমী জামা, গলার

কাছটা খোলা, চোখে পড়ছে ওর রোদ-পোড়া গ্রীবা। যার বিশাল অবয়ব ঘোষণা করছে—ভাখো, এই বনভূমির যোগ্য বাসিন্দা আমি, এইসব আকাশ-ছোঁয়া মহীরুহের প্রতিবেশী। আর মেয়েটি যেন জানান্ দিচ্ছে, ঐ যুবকের সঙ্গে, এই অরণ্যানীর সঙ্গে তার নিয়ত বসবাস, সুবিশাল বনস্পতিক জড়িয়ে ওঠা শক্ত অথচ পেলব বল্লরী সে তার সমস্ত অস্তিত্ব প্রমাণ দিচ্ছে—সে সুখী, এক অনাবিল, সব-জেতা সুখে সে প্লাবিত।

কনুইতে ভর দিয়ে মাথা তুলল মেয়েটি, চোখ রাখল যুবকের চোখে, 'বুঝলে মশাই, তুমি যতটা বলেছিলে, এ জায়গাটা তার থেকেও অনেক সুন্দর। আর এই সুন্দরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা তুজন!'

একটু সরে এল যুবক, মেয়েটির একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে, 'পৃথিবীর আরও অনেক সুন্দর জায়গায় একসঙ্গে ঘুরে বেড়াব আমরা তুজন।'

মেয়েটির মুখে স্নিগ্ধ আভা, 'তা না হয় বেড়াব। তবে এই জায়গাটা ভালোভাবে না দেখে কিন্তু কোথাও যাচ্ছি না আমি। এই বন, এইসব বড় বড় গাছ আর··· আর তোমাকে দেখে দেখে যেন আর আশ মেটে না আমার।'

উঠে বসল যুবক, মেয়েটিকে তুহাতে টেনে নিল নিজের বুকে।

মেয়েটির গলায় ফিসফিস স্বরের গুঞ্জন, 'ওহ্, তুমি····তুমি····,জীবনে তোমার মতো এমন প্রেমিক খুঁজে পাওয়ার আশা আমি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলুম!'

'আর আমি কখনও আশাই করিনি। শুধু জানতুম, একদিন-না-একদিন তোমাকে আমি পাবোই। কি, খুশি তো?'

যুবকের কাঁধে ছিল মেয়েটির হাত। সেই চওড়া কাঁধে আলতো করে চাপ দিয়ে, নিজের উত্তরটুকু জানিয়ে দিল সে। তারপর বহুক্ষণ ওরা তাকিয়ে রইল অরণ্যের দিকে, কথাহীন, শুধু চোখের গভীরে কিছু স্বপ্নের উপনিবেশ।

এক সময় কথা বলল যুবক, 'সেই লালচুলো স্কুল শিক্ষিকার কাছ থেকে কিভাবে পালিয়েছিলুম, সে কথা তো তোমায় বলেছি। তখনই আমি এই জায়গাটায় প্রথম আমি। পায়ে হেঁটেই একা একা ঘুরে বেড়াতুম। দিনে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল হাঁটা আমার কাছে কোন ব্যাপারই ছিল না। একেবারে রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো হয়ে উঠেছিলুম বলতে পারো। তখন কিন্তু তোমার কথা আমার ভাবনায় ছিল না। এ জঙ্গলে শিকারটিকার তেমন মিলত না বটে, তবে ট্রাউট মাছ মিলত প্রচুর। এই টিলাতেই থেকেছি কতদিন। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে আবার যখন এখানে ফিরে আসব তখন আমার সঙ্গে থাকবে তুমি··· তুমি!'

'আর এটাও নিশ্চয়ই ভাবতে পারোনি যে তখন তুমি বক্সিং জগতের সম্রাট হয়ে উঠবে!'

'না, ও-সব নিয়ে আমি মাথাই ঘামাতুম না। বাবা সবসময় বলতেন—বক্সিং জগতের সম্রাট আমি হবই। আমারও তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। বাবা খুব দূরদর্শী ছিলেন। ও-রকম মানুষ আমি আর দেখি নি।'

'কিন্তু তুমি যে ও জগৎ থেকে সরে আসবে, এটা তিনি ভাবতে পারেন নি।'

'কি জানি! বক্সিং জগতের সমস্ত দুর্নীতি আর অসততার দিকগুলো আমার কাছে একেবারে গোপন রেখেছিলেন বাবা। এ থেকে মনে হয়, এ-সব জানতে পারলে আমি যে সরে আসবই, সেটা তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। স্টুবনারের সঙ্গে বাবার চুক্তির কথা তো তোমায় আগেই বলেছি। ঐ চুক্তিতে এইসব নোংরামি আর অসততা সম্বন্ধেও একটা বিশেষ শর্ত রেখেছিলেন বাবা। কিন্তু আমার ম্যানেজার সে শর্ত মানেন নি, চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন। আর এটাই ওনার প্রধান অসততা।'

'অথচ তা সত্ত্বেও তুমি ঐ টম ক্যান্নামের সঙ্গে লড়তে চলেছ, এটা কি ভালো হচ্ছে?'

চকিতে চোখ তুলল যুবক, 'তুমি কি চাও না আমি লড়তে নামি?'

'না গো না! আমি চাই তুমি তোমার ইচ্ছে মতন যা-খুশি করো।'

সদ্যোচ্চারিত কথাগুলো মেয়েটির নিজেরই মনের মধ্যে অনুরণন তুলল। আশ্চর্য, স্যাংস্টার বংশের স্বাধীনচেতা মেয়ে হয়ে এ কথা সে বলল কী করে? তবু, ও জানে, কথাটা সত্য, নি-খাদ সত্য, আর তা বলতে পেরে ও সুখী, খুশি।

যুবকটি বলল, 'লড়াইটা বেশ মজার হবে।'

'কিন্তু ঐ-সব মজাদার ব্যাপারগুলো আমার মাথায় যেন ঠিক ঢুকছে না।'

ব্যাপারটা খুলে বলল যুবকটি, 'গোটা ব্যাপারটা এখনও ঠিক ভেবে উঠতে পারি নি, বুঝলে। ছকটা সাজাতে তুমি হয়ত কিছুটা সাহায্য করতে পারো আমাকে। আসলে, ঐ স্টুবনার আর জুয়াড়িদের সিণ্ডিকেট—দুটোকেই পথে বসাব এবার। দিব্যি জমবে ব্যাপারটা, তাই না? ক্যান্নামকে নক-আউট করে দেব একেবারে প্রথম রাউণ্ডেই। জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের ক্রোধ নিয়ে রিং-এ নামব। আহা, বেচারা ক্যান্নাম! ঝড়টা ওর ওপর দিয়েই যাবে। তবে তার জন্যে আমার আফশোষ নেই, কেননা ও-ও অন্যদের মতোই অসৎ, ঐ সব দুর্নীতির শরিক। শোনো, রিং-এ দাঁড়িয়ে আমি একটা ভাষণ দেব ঠিক করেছি। ব্যাপারটা একটু

অস্বাভাবিক ঠিকই, কিন্তু এতে কাজ হবে। এইসব লড়াই-টড়াইয়ের পিছনে কী কী কলকাঠি নাড়া হয়, সব ফাঁস করে দেব দর্শকদের সামনে। বক্সিং একটা ভালো খেলা, কিন্তু এটাকে ভাঙিয়ে ওরা ব্যবসা করছে, সর্বনাশ করছে খেলাটার। ওহ্, হো, দেখেছ, দর্শকদের বদলে তোমার কাছেই কেমন ভাষণ দিয়ে চলেছি!'

মেয়েটির গলায় বিষণ্ণতার ছোঁয়া, 'আমি যদি সেদিন সবটা নিজের চোখে দেখতে পারতুম।'

সঙ্গিনীর দিকে তাকাল যুবক, 'তোমাকে নিয়ে যেতে পারলে আমিও খুব খুশি হতুম। কিন্তু যাওয়াটা নিরাপদ হবে না। আমি বক্তৃতা শুরু করার পর কী ঘটবে না ঘটবে, কিছুই বলা যাচ্ছে না। তবে কথা দিচ্ছি, লড়াই শেষ হওয়া মাত্রই আমি তোমার কাছে ফিরে আসব। আর তারপর থেকে এই ছোট গ্রেগুনকে আর কোনদিন কোন রিং-এ দেখতে পাবে না কেউ।'

মেয়েটি সংশয়ী, 'কিন্তু তুমি যে জীবনে কোনদিন ভাষণ-টাষণ দাও নি গো! ঠিক-ঠাক বলতে পারবে তো?'

মাথা নাড়ল যুবক, গলায় ফুটে উঠল আত্মপ্রত্যয়ের স্বর, 'আমি একজন আইরিশ। আইরিশরা কথা বলতে পারে না, এমন কথা কেউ কি কোনদিন শুনেছে?' বলতে বলতে ওর মুখে ফুটে উঠল এক অমল হাসি, 'স্টুবনার আমাকে খ্যাপাটে বলে মনে করেন। উনি বলতেন, দাম্পত্য ব্যাপার-স্যাপার নাকি কেউ কাউকে শেখাতে পারে না। তা, আমাদের এই দাম্পত্য জীবন কিম্বা তোমার-আমার সম্বন্ধে, বা অন্য অনেক কিছু সম্বন্ধেই হয়ত এতদিনে বিস্তর জেনে ফেলেছেন ভদ্রলোক। মনে হচ্ছে শুধু স্থাবর সম্পত্তি আর সাজানো লড়াই—এই দুটো ব্যাপারই ওনার জানা নেই! ঐদিন রাতে ও-টুকু শিখিয়ে দেব ওনাকে, আর বেচারা টমকেও। না গো, টমটার জন্যে সত্যি খুব খারাপ লাগছে!'

'আমার দুর্বার বর্বরটি এবার বোধহয় সত্যিসত্যিই দুর্বার আর বর্বর হয়ে উঠতে চলেছে!'

হেসে উঠল যুবকটি, 'সবরকমই চেষ্টা করব আর কি! এই শেষবারের মতো রিং-এ নামছি আমি। তারপর থেকে শুধু তুমি, তুমি আর তুমি! তবে আমার এই শেষ লড়াইটায় নামার ব্যাপারেও যদি তোমার কোন আপত্তি থাকে, তাহলে বলো, আমি লড়ব না।'

'না মশাই না, আমার আপত্তি নেই। অবশ্যই লড়বে তুমি। আমি তোমাকে তোমার মতো করেই চাই, আর তার জন্যে তো তোমাকে নিজের মতোই হয়ে

উঠতে হবে। তুমি যদি লড়তে চাও, তাহলে তোমার জন্যে আর আমার নিজের জন্যে আমিও তা-ই চাই। ধরো, আমি যদি অভিনয় করতে চাইতুম, কিম্বা দক্ষিণ সমুদ্রে বা উত্তর মেরুতে যেতে চাইতুম, তাহলে তুমি কী বলতে?'

খুব ধীর গলায় উত্তর দিল যুবক, 'বলতুম—এগিয়ে যাও। কারণ তুমি হচ্ছো তুমিই, ঠিক নিজের মতোই হয়ে উঠতে হবে তোমাকে, নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করতে হবে। তুমি ঠিক তুমি বলেই আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

মেয়েটিকে দু'হাতের বাঁধনে নিবিড় করে বাঁধল সেই যুবক। তার আলিঙ্গন শিথিল হতে, মেয়েটি বলে উঠল, 'আমরা দুই উদ্ভট মানুষ এক জায়গায় জুটেছি আর কি!'

যুবক খুশিতে উচ্ছ্বসিত, 'এইভাবে এক জায়গায় জুটে কী ভালোই না হয়েছে!'

উঠে দাঁড়াল যুবকটি, সূর্যের দিকে তাকিয়ে বেলার আন্দাজ নিল, তারপর দূরের সেই ময়ূরপঙ্খীরঙা পাহাড়-সারির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ঐখানেই কোথাও কাটাতে হবে আজকের রাতটা। সবথেকে কাছের চটিটা এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে।'

পৃথিবীর খেলাধুলোর ইতিহাসে সে রাতটা অবিস্মরণীয়। সেই রাত, যে রাতে গোল্ডেন গেট এরিনায় প্যাট ম্লেগুনের হাতের ছোঁয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল টম কন্ন্যান আর টমের থেকেও বড় মাপের আর এক মুষ্টিযোদ্ধা। প্রায় একঘণ্টা ধরে বিক্ষোভের ঝড় বয়ে গিয়েছিল দর্শকদের মধ্যে, যে ঘটনার পরই সুপারভাইজারদের ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়েছিল, অভিযুক্ত হয়েছিল ঠিকাদার আর সংস্থার তত্ত্বাবধায়করা, এক কথায় ওলোট-পালোট হয়ে গিয়েছিল গোটা বক্সিং জগৎটা। একেবারেই অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটনাটা ঘটল। এমনকি স্বয়ং স্টুবনারও কিছু আঁচ করতে পারেন নি আগে থেকে। হ্যাঁ, প্যাট পাওয়ার্সকে নিয়ে ঐ ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর তার যোদ্ধাটি তাঁকে অগ্রাহ্য করেছে, চলে গেছে, বিয়ে করেছে—সবই সত্যি। কিন্তু সে-সব চুকে বুকে যাওয়ার পর বক্সিং জগতের অপরিহার্য দুর্নীতিকে মেনে নিয়ে প্রত্যাশামতোই তো ফিরে এসেছে প্যাট!

গোল্ডেন গেট বক্সিং এরিনাটা নতুন বানানো হয়েছে। এই ধরণের এত বড় স্টেডিয়াম গোটা সান ফ্রান্সিসকোয় আর একটাও নেই। এই লড়াই দিয়েই উদ্বোধন হচ্ছে হলটার, পঁচিশ হাজার লোকের বসার ব্যবস্থা আছে। সেই পঁচিশ হাজারের একটা আসনও খালি নেই আজ। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে মুষ্টিযুদ্ধ প্রেমীরা এসে হাজির হয়েছে। রিং-এর সামনের আসনের জন্য তাদের গুনতে হয়েছে পঞ্চাশ ডলার করে। সবথেকে সস্তা আসনের জন্যও পাঁচ ডলার করে দিতে হয়েছে দর্শকদের।

চিরাচরিত উল্লাসধ্বনির মধ্যে দিয়ে মঞ্চে উঠলেন বর্ষীয়ান ঘোষক বিলি মর্গ্যান। দড়ি গলে ভিতরে ঢুকলেন তিনি, টুপিটা খুললেন, আলোয় ঝকমক করে উঠল তাঁর একমাথা পাকাচুল। কিছু বলার জন্য সবে মুখ খুলছেন মর্গ্যান, এমন সময় কোথাও মড়মড় করে আওয়াজ উঠল। কাছেই কটা নিচু আসনের সারি ভেঙে পড়েছে। কেউ অবশ্য আহত-টাহত হয় নি। দর্শকদের মধ্যে হাসির হররা, রসিকতা, টীকা-টিপ্পনী। একদিকে আসন ভেঙে পড়া, অন্যদিকে এই ভয়ঙ্কর

শোরগোল দেখে সচকিত হয়ে উঠলেন দায়িত্বশীল পুলিসপ্রধান। একজন সহকারীর দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচিয়ে ইঙ্গিত করলেন তিনি, যেন বলতে চাইলেন—কি হে, আজ রাতটা ভালোয় ভালোয় কাটবে তো!

পুরানো আমলের সাতজন মুষ্টিযোদ্ধাকে একে একে মঞ্চে আনা হল। প্রত্যেকেই এখনও বেশ শক্ত সমর্থ, প্রত্যেকেই হেভিওয়েট বক্সিংয়ের প্রাক্তন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন। একেক জনের সম্বন্ধে এক একটা লাগসই বিশেষণ ব্যবহার করে তাদের পরিচিতি জানালেন বিলি মর্গ্যান। একজনকে আখ্যাত করলেন 'সং জন' নামে, আরেক জনের পরিচয় দিলেন 'বিশ্বস্ত বৃদ্ধ' হিসেবে। বাকিদের বিশেষণগুলো হচ্ছে—'সর্বকালের সেরা দু'হাতি যোদ্ধা', 'একশ যুদ্ধের বিজয়ী বীর,' 'অপরাজিত,' 'কোনদিন নক-আউট হননি', 'সেকালের সবথেকে দুর্দান্ত লড়িয়ে', 'একবার খেতাব হারিয়েও একমাত্র যিনি তা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন', 'সেকালের শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী' আর 'সবথেকে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী'।

পরিচয়পর্ব শেষ হতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। কিছু-না-কিছু বলার অনুরোধ করা হল সাতজনকেই। মুখভরা গর্বের আভা আর অপ্রতিভতা নিয়ে প্রত্যেকেই কিছু কথা বিড়বিড় করে বলে গেলেন। সবথেকে দীর্ঘ ভাষণ দিলেন 'বিশ্বস্ত বৃদ্ধ' —এক মিনিট! তারপর ছবি-টবি তোলার পালা। রিং-এ এসে দাঁড়ালেন বিখ্যাত লোকেরা—কুস্তির চ্যাম্পিয়নরা, বিখ্যাত প্রশিক্ষকরা, প্রাক্তন সময়রক্ষক আর রেফারিরা। তাছাড়াও জুটে গেল এক দঙ্গল লাইটওয়েট আর মিডলওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা। প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেককে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। ন্যাট পাওয়ার্সও হাজির। সে হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করে প্যাট গ্লেণ্ডনের সঙ্গে আবার লড়ায়ের দাবি জানালো। পাওয়ার্সের আগে যতজন ধরাশায়ী হয়েছে গ্লেণ্ডনের হাতে, তারাও লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে একই দাবি করে গেলো সোৎসাহে। সেই সঙ্গেই সকলে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে জিম হ্যানফোর্ডকেও। জিম হ্যানফোর্ড ঘোষণা করল—আজকের লড়াইয়ের বিজয়ীর সঙ্গেই সে তার পরের লড়াইটা লড়তে নামবে। দর্শকরা তৎক্ষণাৎ আজকের লড়াইয়ের সম্ভাব্য বিজয়ীর নাম নিয়ে হৈ-হল্লা জুড়ে দিল। একদল উন্মত্তের মতো হাকতে লাগল—'গ্লেণ্ডন, গ্লেণ্ডন'। আর একদল হুংকার দিল—'ক্যান্নাম, ক্যান্নাম।' এইসব হৈ-হট্টগোলের মধ্যেই ভেঙে পড়ল আরও একসারি আসন। খান ছয়েক সারি ঝুলে রইল জুয়াড়ি আর কর্মকর্তাদের সারির মাঝখানে। হাল দেখে পুলিসপ্রধান জরুরী বার্তা পাঠালেন সদরদপ্তরে—আরও পুলিস পাঠাও!

দর্শকরা উত্তেজিত, টানটান। রিং-এ প্রবেশ করল ক্যান্নাম আর প্যাট। এক একজনের প্রবেশের পর টানা পাঁচ মিনিট অবিরাম উল্লাসধ্বনি, যেন কোন রাজনৈতিক সম্মেলন-টম্মেলন হতে চলেছে! তারপর অন্য সকলে নেমে গেল রিং থেকে। নিজের কোণে গিয়ে বসল প্যাট, চারপাশে ওর সহকারীরা। আর যথারীতি ওর ঠিক পিছনে স্টুবনারও এসে হাজির। প্রথমে পরিচয় দেওয়া হল ক্যান্নামের। মাথা ঝুঁকিয়ে দর্শকদের অভিবাদন জানাল ক্যান্নাম। দর্শকরা চিৎকার করে জানাল—কিছু বলতে হবে ওকে। একটু থমকে গেল ক্যান্নাম, তবু কষ্টেসৃষ্টে গোটাকতক কথা বলার চেষ্টা করল।

'আজ রাতে এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি'। দর্শকদের বাঁধভাঙা উল্লাসের অবসরে আরও কিছু কথা ভেবে নিল ক্যান্নাম, 'সারাজীবন আমি সৎভাবে লড়েছি। কেউই এ-কথা অস্বীকার করতে পারবেন না। কথা দিচ্ছি, আজ আমি সর্বশক্তি দিয়ে লড়ার চেষ্টা করব।'

দর্শকদের মধ্যে থেকে ভেসে এল নানান চিৎকার—'ঠিক বলেছ টম', 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা তো জানিই', 'শাবাশ টম', 'আজ তোমাকে ঠেকায় কে'!

এবার প্যাটের পালা। ওর কাছ থেকেও কিছু কথা শুনতে চাইল দর্শকরা (যদিও রিং-এ দাঁড়িয়ে ভাষণ দেওয়াটা একেবারেই অপ্রচলিত)। হাত তুলে সকলকে চুপ করতে বললেন বিলি মর্গ্যান। স্পষ্ট গলায় বলতে শুরু করল প্যাট:

'এতক্ষণ প্রত্যেকেই বলে গেলেন, আজ এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে তাঁরা গর্ব অনুভব করছেন, কিন্তু আমি কোন গর্ব অনুভব করতে পারছি না।'

চমকে উঠল দর্শকরা। তাদেরকে সামলে ওঠার জন্য অনেকটা সময় দিয়ে, আবার শুরু করল প্যাট:

'আমার এইসব সঙ্গী-সাথীদের জন্য আমি আদৌ গর্বিত নই। আপনারা ভাষণ শুনতে চেয়েছেন। আমি আজ একটা সাচ্চা ভাষণই আপনাদের শোনাতে চাইছি। জেনে রাখুন, আজকের লড়াইটাই আমার শেষ লড়াই। এর পর আর আমাকে কোনদিন রিং-এ দেখতে পাবেন না আপনারা। কেন এ সিদ্ধান্ত নিতে হল? কারণটা আমি আগেই বলেছি—আমার সঙ্গী-সাথীদের আমি পছন্দ করি না। এই বক্সিং-এর জগৎটা দুর্নীতি আর অসততায় একেবারে ডুবে আছে। এর সঙ্গে যুক্ত কেউই নিজেকে এইসব নোংরামির বাইরে রাখতে পারে না। একেবারে ছোট ছোট ক্লাবগুলো থেকে শুরু করে আজকের এই লড়াই—সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে দুর্নীতি।'

বিস্ময়ের গুঞ্জন এবার ফেটে পড়ল গর্জন হয়ে। অনেকের গলায় বিদ্রূপ, আবার অনেকে গলা ফাটিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে—'লড়াই শুরু করো', 'আমরা লড়াই দেখতে চাই', 'আরে লড়াইটা এখনও শুরু করছ না কেন।'

চুপচাপ অপেক্ষা করছিল প্যাট, আর লক্ষ্য করছিল—রিং-এর ধারে বসে থাকা প্রোমোটার, ম্যানেজার আর মুষ্টিযোদ্ধারাই বেশি তাল ঠুকছে। কিছু বলার চেষ্টা করল ও। প্রবল হট্টগোলে একটা কথাও শোনা গেল না। দর্শকরা স্পষ্টতই দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে। একদল চেঁচাচ্ছে—'লড়াই চাই, লড়াই!' আর একদল হাঁকছে, 'বলে যাও, বলে যাও!'

মিনিট দশেক হল্ উত্তাল. স্টুবনার, রেফারি. এরিনার মালিক. আজকের লড়াইয়ের প্রোমোটার—সকলেই প্যাটকে অনুরোধ করলেন লড়াই শুরু করার জন্য। কারুর কথায় কর্ণপাত করল না প্যাট। রেফারি জানালেন—প্যাট এখনই লড়াই শুরু না করলে তিনি টম ক্যান্নামকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করবেন।

ফুঁসে উঠল প্যাট, 'না, তা আপনি করতে পারেন না। যদি করেন, শুনে রাখুন, আমি সবকটা আদালতে আপনার নামে মামলা দায়ের করব। আর দর্শকদের এভাবে বঞ্চিত করলে ওরাই কি আপনাকে ছেড়ে দেবে ভেবেছেন? তাছাড়া, আমি তো লড়তে অস্বীকার করছি না! কিন্তু লড়ার আগে আমি আমার বক্তব্যটা শেষ করতে চাই।'

'কিন্তু এটা তো নিয়মবিরুদ্ধ'—রেফারি প্রতিবাদ জানান।

'আদৌ নিয়মবিরুদ্ধ নয়। রিং-এ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়ার বিরুদ্ধে একটা কথাও লেখা নেই আইনে। এই তো একটু আগেই নামকরা সব মুষ্টিযোদ্ধারা এখানে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে গেলেন।'

প্রোমোটারের চিৎকার শোনা গেল, 'তাঁরা মাত্র দু'চারটে কথা বলেছেন; কিন্তু তুমি একটা পুরো ভাষণ দিতে চাইছ!'

প্যাটের উত্তর. 'আইনে ভাষণ দেওয়ার বিরুদ্ধে কিছু লেখা নেই! যাক এবার রিং থেকে নেমে যান সবাই, নাহলে সবকটাকে তুলে আছাড় মারব।'

প্রোমোটারের কোটের কলারটা ধরে তাঁকে তুলে নিল প্যাট, ঝট্‌কা মেরে নামিয়ে দিল রিং-এর বাইরে। অসহায়ের মতো হাত-পা ছুঁড়ল প্রোমোটারটি। লোকটি বিশালবপু, কিন্তু প্যাট যেন অনায়াসে তাঁকে টেনে তুলল এক হাতে! দর্শকরা মোহিত, উত্তাল। বক্তৃতা শোনার দাবি এখন অনেক তীব্র, সোচ্চার! স্টুবনার এবং এরিনার মালিক বুদ্ধিমানের মতো পিছু হঠলেন। কথা বলার আগে হাত

তুলল প্যাট। দ্বিগুণ উদ্যমে চিৎকার করে উঠল লড়াইপন্থীরা। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল আরও দু'তিন সারি আসন। ঐ-সব আসনের লোকেরা ছুটল অন্য আসনের সন্ধানে, জোরজার করে অন্যদের আসনে বসার জন্য গুঁতোগুঁতি শুরু করে দিল। ক্ষেপে উঠল পিছনের দর্শকরা। তাদের সামনেটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, দেখতে অসুবিধে হচ্ছে। চিল-চিৎকার জুড়ে দিল তারা—বসুন, বসুন! আরে বসে পড় চাঁদু!

রিং-এর দড়ির কাছে এগিয়ে গেল প্যাট, একটু ঝুঁকে পড়ে পুলিসপ্রধানকে চিৎকার করে (চিৎকার করতে বাধ্যই হল ও) বলল:

'আমি বক্তৃতা না দিলে লোকে হলটা ভেঙে তছনছ করে দেবে। জনতা একবার ক্ষেপে উঠলে আর ওদের সামলাতে পারবেন না। কাজেই এখনই ব্যবস্থা নিন। আপনি শুধু দেখুন কেউ যেন রিং-এ উঠতে না পারে, দর্শকদের সামলানোর দায়িত্ব আমার।'

কথা সেরে রিং-এর মাঝখানে ফিরে এল প্যাট, তুলে ধরল দুটো হাত।

'আপনারা কি আমার কথা শুনতে চান?' বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন রাখল ও।

রিং-এর কাছাকাছি বসে থাকা শতখানেক লোক ওর কথাটা শুনতে পেয়ে চিৎকার করে জানান্ দিল, 'হ্যাঁ, চাই!'

'তাহলে যাঁরা শুনতে চান, তাঁরা প্রত্যেকে পাশের জনকে চুপ করান।'

পরামর্শটা কাজে লাগল। কিছুটা শান্ত হল দর্শকরা। আবার চিৎকার করে একই কথা বলল প্যাট। অনেকটা দূরের লোকেরাও এবার ওর গলা শুনতে পেল। পরপর বেশ কয়েকবার কথাটা বলে গেল প্যাট। একটু একটু করে নেমে এল নৈঃশব্দ। শুধু মাঝে-মধ্যে কিছু চাপা গলা, দু' একটা চড় থাপ্পড়ের আওয়াজ। সব প্রায় চুপ, শান্ত, এমন সময় রিং-এর কাছাকাছি আরও একসারি আসন ভেঙে পড়ল মড়মড় করে। আবার একটা হাসির হররা, তারপর আবার স্তব্ধ প্রহর। সেই নৈঃশব্দের বুক চিরে অনেক দূর থেকে ভেসে একটা কণ্ঠস্বর, 'শুরু করো গ্লেগুন। আমরা তোমার পাশে আছি।'

যে-কোন কেল্ট্-এর মতোই জনতার মনস্তত্ত্ব বোঝার ক্ষমতা প্যাটের সহজাত। ও জানে, পাঁচ মিনিট আগের সেই বিশৃঙ্খল জনতা এখন ওর হাতের মুঠোয়। তবু, ওদের আগ্রহটা জিইয়ে রাখার জন্য, আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করল ও। নিখুঁত হিসেব। যতটুকু অপেক্ষা করা দরকার, ঠিক ততটুকু। আধ মিনিটের মধ্যে হল্ জুড়ে নেমে এল সূঁচ-পড়া নৈঃশব্দ। দর্শকদের চোখে-মুখে ফুটেওঠা

সম্ভ্রম। যে মুহূর্তে ও বুঝতে পারল দু'একজন আবার উসখুস করতে শুরু করছে, সেই মুহূর্তে কথা শুরু করল ও:

'এই ভাষণ শেষ হওয়া মাত্রই আমি লড়াই শুরু করব। কথা দিচ্ছি, আজ একটা সত্যিকারের লড়াই দেখতে পাবেন আপনারা। এ-রকম সাচ্চা লড়াই আপনারা খুব বেশি দেখেননি, এটুকু জোর দিয়েই বলতে পারি। যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করব আমি। চূড়ান্ত ঘোষণা করার সময় বিলি মর্গ্যান আপনাদের জানাবেন—এ লড়াই চলবে পঁয়তাল্লিশ রাউণ্ড পর্যন্ত; কিন্তু শুনে রাখুন, এ লড়াই পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড অবধিও গড়াবে না।

'এ ভাষণ যখন বন্ধ করতে হয়েছিল, তখন আমি বলছিলুম বক্সিং জগৎটা হচ্ছে নোংরামিতে ভরা। হ্যাঁ, আপাদ-মস্তক, একেবারে ওপরতলা থেকে নিচতলা পর্যন্ত নোংরামিতে ডুবে আছে সবটা। স্রেফ ব্যবসা, বুঝলেন, স্রেফ ব্যবসা। আর ব্যবসা বলতে কী বোঝায়, তা তো আপনাদের জানাই আছে। আর আপনারা? নেহাতই নির্বোধ। কেন এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন না আপনারা? কেন আজ ঐ সব আসনগুলো ভেঙে পড়ল জানেন? দুর্নীতি আর অসততার জন্য। লড়াইটাও ব্যবসা, আর ঐ সব আসন তৈরীর পিছনেও কাজ করেছে সেই একই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি।'

দর্শকরা আবিষ্ট, আর সেটা বুঝতে এতটুকুও অসুবিধে হচ্ছে না প্যাটের।

'আমি দেখতে পাচ্ছি, দুটো আসনে আপনাদের তিনজনকে ঠেসাঠেসি করে বসতে হচ্ছে। কেন? সেই অসততার জন্যই। এখানকার তত্ত্বাবধায়করা কোন মাইনে পান না। ধরে নেওয়া হয়, অসাধু উপায়ে কিছু রোজগার তাঁরা করে নেবেন ঠিকই। সেই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। আর এ-সবের দাম দিতে হচ্ছে আপনাদের। হ্যাঁ, আপনাদেরই। লড়াইয়ের অনুমোদন কিভাবে পাওয়া যায়? অসৎ উপায়ে। আচ্ছা, তাহলে এবার বলি, যারা আসনগুলো বানালো তারা যদি অসততা করতে পারে, তত্ত্বাবধায়করা যদি অসততা করতে পারে, হলের কর্তৃপক্ষ যদি অসততা করতে পারে, তাহলে বড় বড় বক্সাররাই বা করবে না কেন? শুনে রাখুন, তারাও অসততা করে। আর তার জন্যও দাম দেন আপনারাই।

'তবে, দোষটা কিন্তু মুষ্টিযোদ্ধাদের নয়, কেননা পুরো ব্যাপারটা তাদের হাতে নেই। পুরো ব্যাপারটা কব্জা করে রেখেছে প্রোমোটার আর ম্যানেজাররা। এরা হচ্ছে জাত ব্যবসায়ী। মুষ্টিযোদ্ধারা তো নিছক লড়িয়ে মাত্র। তারা

সৎভাবেই জীবন শুরু করে, কিন্তু এইসব ম্যানেজার আর প্রোমোটাররা তাদের বাধ্য করে সমস্ত অন্যায় মেনে নিতে, আর না মানলে তাদের দূর করে দেয় বক্সিংয়ের জগৎ থেকে। হ্যাঁ, আগেকার আমলে কিছু সৎ মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন, এখনও কয়েকজন আছে। কিন্তু সংখ্যায় তারা নেহাতই নগণ্য। সৎ ম্যানেজারও হয়ত আছেন দু'চারজন। আর আমার ম্যানেজার? ভদ্রলোক একটি চোর-চূড়ামণি বিশেষ। কত স্থাবর সম্পত্তি আর কতগুলো বাড়ি উনি খরিদ করেছেন, একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন!'

আবার তুমুল গর্জন উঠল একটা। প্যাটের কথাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে ওরা।

'যাঁরা আমার কথা শুনতে চান, তাঁরা নিজের নিজের পাশের লোককে চুপ করান'—নির্দেশ দিল প্যাট।

আবার কিছু চড়-থাপ্পড়ের আওয়াজ, চাপা গুঞ্জন, তারপর সব নিস্তব্ধ, রুদ্ধশ্বাস।

'কেন প্রত্যেক মুষ্টিযোদ্ধা জোরগলায় বলে যে সে সারা জীবন সৎভাবে লড়েছে? সৎ জন, সৎ বিল, সৎ ব্ল্যাকস্মিথ—এ-সব নাম কেন আমদানী করতে হয়? আপনাদের কি একবারও মনে হয় না যে আসলে এরা কিছু-একটা চাপা দিতে চায়? কোন লোক যখন নিজেকে সৎ বলে হাঁক দেয়, তখন তার সম্বন্ধে একটা সন্দেহ আমাদের মনে জেগে ওঠেই। কিন্তু কোন মুষ্টিযোদ্ধা যখন একই কথা গেলাতে চায় আপনাদের, তখন আপনারা তা মেনে নেন মুখ বুজে।

'আচ্ছা, যোগ্য যোদ্ধাই জিতুক—এই কথাটা আপনারা বিলি মর্গ্যানের মুখে কতবার শুনেছেন? জেনে রাখুন, যোগ্য যোদ্ধা এখানে সবসময় জেতে না। আর যখন জেতে, তখন তার সমস্ত বন্দোবস্ত আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। যে সমস্ত মরণ-বাঁচন লড়াইয়ের কথা আপনারা শুনেছেন বা দেখেছেন, সেগুলোও বেশিরভাগ সময়ই আগে থেকে ঠিক করা থাকে। সব সাজানো, গোটা ব্যাপারটাই সাজানো। প্রোমোটার আর ম্যানেজাররা কি নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ঘুরঘুর করে বেড়ায়? না, এরা কারবার ফেঁদে বসেছে।

'ধরুন টম, ডিক আর হ্যারি তিনজন মুষ্টিযোদ্ধা। এদের মধ্যে ডিক হচ্ছে সেরা। দুটো লড়াইতেই সে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে কী ঘটে? টম হ্যারিকে পেটায়, ডিক টমকে পেটায়, হ্যারি ডিককে পেটায়। কে সেরা, তার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। তারপর হয় ফিরতি লড়াই। সেখানে হ্যারি পেটায় টমকে, টম পেটায় ডিককে আর ডিক পেটায় হ্যারিকে। কারুরই শ্রেষ্ঠত্ব

প্রমাণিত হয় না। আবার শুরু হয় খেল্‌। ডিক ফুঁসে ওঠে। হুঙ্কার দেয়—নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সে প্রমাণ করতে চায়। তখন ডিক টমকে পেটায়, তারপর হ্যারিকেও পেটায়! যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যেত মাত্র দুটো লড়াইতে, সেটার জন্য আটবার লড়তে হয় ডিককে। সব সাজানো। সব এইভাবেই চলছে। আর তার জন্য মূল্য দিয়ে যাচ্ছেন আপনারা। কখনও আসন ভেঙে পড়ছে, আবার কখনও তত্ত্বাবধায়করা আপনাদের পকেট কাটছে।

'হ্যাঁ, সরাসরি লড়াই হলে মুষ্টিযুদ্ধ যে একটা রীতিমতো উপভোগ্য খেলা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুযোগ পেলে মুষ্টিযোদ্ধারা সরাসরি লড়তেই পারে। কিন্তু ফাঁদটা যে অনেক বড়। এখানে কয়েকজন লোক তিনটে লড়াই থেকে পাওয়া প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ ডলার নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার মওকা পায়।'

প্রবল চিৎকারের ধাক্কায় থামতে হল প্যাটকে। চারদিক থেকে অজস্র চিৎকার ভেসে আসছে। দু'একটা কানে এল ওর—'কিসের সাড়ে সাত লাখ ডলার?' 'তিনটে লড়াই মানে?' 'বলো, বলো', 'চালিয়ে যাও'। সেই সঙ্গেই ভেসে আসছে কিছু বিদ্রূপ, গালিগালাজ, আর কয়েকজনের গলাবাজি, 'স্রেফ কুৎসা, স্রেফ কুৎসা!'

গলা তুলল প্যাট, 'শুনতে চাইলে চুপ করে বসুন।'

তারপর আবার আধ মিনিট চুপ করে রইল ও। দর্শকরা শান্ত হয়ে এল। বলতে শুরু করল প্যাট:

'জিম হ্যানফোর্ড কী ভাবছেন? তাঁর আর আমার লোকজনরা কী মতলব আঁটছে? ওরা জানে, আমার হাতে ওনার নিস্তার নেই। উনি নিজেও সেটা জানেন। একটা লড়াইতেই ওনাকে পিটিয়ে ছাতু করে দিতে পারি আমি। কিন্তু উনি হচ্ছেন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন। কাজেই আমি যদি ঐ সাজানো বন্দোবস্তটা মেনে না নিই, তাহলে ওরা কোনদিন ওনার সঙ্গে লড়ার সুযোগ দেবে না আমাকে। এই বন্দোবস্তে তিনটে লড়াইয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রথম লড়াইটায় আমি জিতব। সান ফ্রান্সিসকোয় যদি সম্ভব না হয়, তাহলে লড়াইটা হবে নেভাদায়। লড়াইটা বেশ জমিয়ে তুলতে হবে আমাদের। দুজনকেই কুড়ি হাজার ডলার করে বাজি রাখব। ডলারগুলো আমরা জমা দেব বটে, তবে এই বাজিটা কিন্তু সত্যিকারের বাজি নয়। দুজনেই দুজনের অর্থ ফেরৎ পেয়ে যাব। বাজির লাভের বখরার ব্যাপারেও তাই। দুজনে সমান সমান পাব। তবে দর্শকদের কাছ থেকে

পাওয়া অর্থের ভাগাভাগিটা একটু অন্যরকম হবে। একজন পাবে শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ, অপরজন পাবে পঁয়ষট্টি। তারপর ধরুন সিনেমার ছবি তোলার রয়্যালটি, বিজ্ঞাপন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ আর অন্য সব টুকিটাকি মিলিয়ে মোট অন্তত আড়াই লক্ষ ডলার তো হবেই। এই অর্থটা ভাগাভাগি করে নেব আমরা দুজন। তারপর হবে ফিরতি লড়াই। সে লড়াইতে জিতবেন হ্যানফোর্ড। প্রাপ্ত অর্থটা আবার ভাগাভাগি করে নেব আমরা। অবশেষে আপনারা দেখবেন তেসরা লড়াইটা। সে লড়াইতে আমিই জিতব, কারণ জেতার হক্ তো আমারই! তাহলে এই তিনটে লড়াই মিলিয়ে দর্শকদের পকেট থেকে খসবে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ ডলার। এইরকম ভাবেই ছকটা সাজানো হয়েছে। কিন্তু এ অর্থ নোংরামিতে ভরা, দূষিত। তাই আজ রাতেই আমি বক্সিং রিংকে চিরবিদায় জানাচ্ছি…'

আর ঠিক তখনই ছিটকে উঠে দাঁড়াল জিম, জিম হ্যানফোর্ড, একজন পুলিসকে সপাটে লাথি কষিয়ে ছুটে এল সামনে, তারপর বিশাল শরীরটা নিয়ে দড়ি গলে ঢুকে পড়ল। হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'মিথ্যে! সব মিথ্যে!'

খ্যাপা ষাঁড়ের মতো প্যাটের দিকে ধেয়ে গেল হ্যানফোর্ড। ঘুরে দাঁড়াল প্যাট মুহূর্তের ভগ্নাংশে সরে গেল এক পাশে। টাল সামলাতে না পেরে দড়ির ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল হ্যানফোর্ড। তারপর দড়ির ধাক্কায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আবার ধেয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। আর ঠিক তখনই…

ঠিক তখনই আঘাত হানল প্যাট। ঠাণ্ডা মাথায়, হিসেব কষে, হ্যানফোর্ডের চোয়ালটা তাক করল ও, তারপর জীবনে এই প্রথম, সে পূর্ণশক্তিতে ঘুষি চালাল। ঐ ভয়ঙ্কর ঘুষির সঙ্গে মিশে ছিল ওর সবটুকুও শক্তি ও প্রচণ্ড বেগ, এমনকি ঘৃণার বাড়তি শক্তিটুকুও।

ছিটকে গেল হ্যানফোর্ডের শরীরটা। শূন্যে ভাসছে ও, মৃত প্রায় অর্থাৎ অজ্ঞান। প্যাটের ঘুষি চোয়ালে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হারিয়েছে ও। দুটো পা-ই শূন্যে। ওর বিশাল শরীরটা আছড়ে পড়ল সবথেকে ওপরের দড়িটার গায়ে, তারপর ঝুলে পড়ল নিচের দিকে আর শেষমেষ দড়ির মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে পড়ল নিচে বসে থাকা সাংবাদিকদের ঘাড়ে।

দর্শকরা উত্তাল। টিকিটের দামের থেকে অনেক বেশিই উশুল হয়ে গেছে তাদের, কেননা জিম হ্যানফোর্ড, বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন জিম হ্যানফোর্ড, নক-আউট হয়ে গেছে ওদের চোখের সামনে! না, রীতিমাফিক কোন লড়াই হয় নি বটে,

কিন্তু বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন নিথর হয়ে গেছে স্রেফ একটা ঘুষিতে! বক্সিং জগতে এ ঘটনা নজিরবিহীন, এ-রকম কোন রাতের সাক্ষী কখনো হয়নি দর্শকরা। একটু বিষণ্ণ চোখে নিজের চোট-খাওয়া আঙুলগুলোর দিকে তাকাল প্যাট। তারপর ওর চোখ খুঁজে নিল হ্যানফোর্ডকে। টলমলে পায়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে হ্যানফোর্ড। ডান হাতটা উঁচুতে তুলে ধরল প্যাট, মন্ত্রমুগ্ধের মতো শান্ত হয়ে গেল দর্শকরা।

প্যাট আবার বলতে শুরু করল, 'আমি যখন প্রথম লড়তে শুরু করি, তখন লোকে আমাকে বলত এক-ঘুষির গ্রেগুন। একটু আগেই আপনারা আমার ঘুষির জোরটা দেখেছেন। ও-রকম জোর আমার ঘুষিতে বরাবরই ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর নজর রাখতুম আমি, তারপর সুযোগ বুঝে একখানা ঘুষি চালাতুম। তবে কখনোই পূর্ণশক্তিতে মারি নি কাউকে। তারপর আমার কানে মন্ত্র দেওয়া হল। আমার ম্যানেজার বোঝালেন আমি নাকি দর্শকদের প্রতি অবিচার করছি, দর্শকদের অর্থটা উশুল করার জন্য আরও বেশিক্ষণ ধরে লড়াই চালানো উচিত। আমি ছিলুম নিরেট বোকা, বুদ্ধুও বলতে পারেন। পাহাড়ের ছেলে আমি, বুদ্ধিশুদ্ধিতে নেহাতই কাঁচা। তাই ওনার কথাটাকে সত্য বলেই মেনে নিলুম। ঠিক কোন্ রাউণ্ডে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করতে হবে, সেটা আমার ম্যানেজার আগে থেকেই ঠিক করে দিতেন। তারপর আর কি! খবরটা পৌঁছে দিতেন জুয়াড়িদের সিণ্ডিকেটের কাছে, ঝাঁপিয়ে পড়ত তারা, ফয়দা লুটত সকলে মিলে। হ্যাঁ, অর্থটা আসত আপনাদেরই পকেট থেকে। তবে একটা সান্ত্বনা আমার আছে—ঐ অর্থের একটা সেণ্টও আমি ছুঁইনি কোনদিন। ওরা আমাকে লাভের বখরা দেওয়ার সাহস পেত না, কারণ ওরা বুঝেছিল এ-সব খবর আমি জানলে ওদের এই সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে।

'আচ্ছা, ন্যাট পাওয়ার্সের সঙ্গে আমার লড়াইটার কথা তো আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে! জেনে রাখুন, আমি ওকে নক-আউট করিনি। লড়াইটার আগে আমার মনে কিছু সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। এই চক্রের লোকেরা তখন ওর সঙ্গেই পাকা বন্দোবস্ত করে নেয়। সে খবরটা আমার জানা ছিল না। আমি চেয়েছিলুম লড়াইটাকে ষোল রাউণ্ডের বদলে আঠার রাউণ্ড পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাব। ষোল রাউণ্ডের মাথায় ওকে যে ঘুষিটা আমি মেরেছিলুম, তাতে মোটেই এমন কিছু জোর ছিল না। কিন্তু তাসত্ত্বেও ও নক-আউট হওয়ার ভান করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল, বোকা বানালো আপনাদের সবাইকে।'

দর্শকদের মধ্যে থেকে একজনের গলা ভেসে এল, 'আজকের লড়াইটাও কি সাজানো লড়াই?'

প্যাট উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, এটাও সাজানো। সিণ্ডিকেট কিভাবে বাজি ধরছে জানেন? চৌদ্দ রাউণ্ডের মাথায় ক্যান্নাম হারবে—এর ওপরেই বাজি ধরছে ওরা।'

আবার কান-ফাটা চিৎকার, গর্জন। শেষবারের মত হাত তুলে সকলকে শান্ত হতে বলল প্যাট। আর জানাল, 'আমার কথা প্রায় শেষ। শুধু আর একটা কথা শুনে নিন। আজ রাতে সিণ্ডিকেটকে পথে বসতে হবে। আজকের লড়াইটা একেবারে সরাসরি লড়াই-ই হবে। চৌদ্দ রাউণ্ড পর্যন্ত রিং-এ থাকবে না টম ক্যান্নাম। লড়াই শেষ হয়ে যাবে প্রথম রাউণ্ডেই!'

ছিটকে লাফিয়ে উঠল ক্যান্নাম, ক্ষিপ্তকণ্ঠে চিৎকার করে বলল, 'পারবে না, কিছুতেই পারবে না। আমাকে এক রাউণ্ডে শুইয়ে দিতে পারে, এমন বান্দা পয়দা হয়নি এখনও।'

ওর কথায় কর্ণপাত না করে প্যাট বলে চলল, 'জীবনে এই প্রথম পূর্ণশক্তিতে ঘুষি চালিয়েছি আমি। খানিক আগে সে ঘুষিটা হ্যানফোর্ডের ওপর পড়তে দেখেছেন আপনারা! আজ রাতে আর একবার পূর্ণশক্তিতে আঘাত করব আমি। অবশ্য ক্যান্নাম যদি এখনই রিং ছেড়ে পালায়, তাহলে আলাদা কথা। আমি প্রস্তুত।'

নিজের কোণে এগিয়ে গেল প্যাট, দস্তানা পরার জন্য হাত দুটো বাড়িয়ে দিল সহকারীদের দিকে। বিপরীত দিকে ক্ষিপ্ত ক্যান্নামকে শান্ত করার বৃথা চেষ্টা করে চলেছে তার সহকারীরা! আর এতক্ষণ পর, চূড়ান্ত ঘোষণা করার জন্য মুখ খোলার সুযোগ পেলেন বিলি মর্গ্যান।

'এ লড়াই পঁয়তাল্লিশ রাউণ্ড পর্যন্ত চলবে। লড়াই হবে কুইন্সবেরির মার্কুইসের নিয়ম অনুযায়ী। যোগ্য ব্যক্তিই জয়ী হবেন! স্টার্ট!'

বেজে উঠল ঘণ্টি। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এগিয়ে গেল পরস্পরের দিকে। রীতিমাফিক করমর্দনের জন্য নিজের ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল প্যাট। ক্রুদ্ধ ক্যান্নাম মাথাটা ঝাঁকাল একবার, হাত মেলাল না প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে।

সবিস্ময়ে দর্শকরা লক্ষ্য করল, রিং-এ নামার পর ক্যান্নাম কিন্তু একবারও উন্মত্তের মতো ধেয়ে আসছে না প্যাটের দিকে। প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হলেও, ঠাণ্ডা মাথায় সতর্ক হয়ে লড়ার চেষ্টা করছে। ওর আহত গর্ব ওকে খোঁচাচ্ছে—যে করেই হোক এই

রাউণ্ডটা টিকে থাকতে হবে। বার কয়েক অবশ্য হাত চালাল ক্যান্নাম, কিন্তু একবারও নিজের রক্ষণ শিথিল করল না। মেঝেতে বাঁ পা ঠুকে ঠুকে এগোচ্ছে প্যাট, রিং জুড়ে তাড়া করে বেড়াচ্ছে ক্যান্নামকে। কিন্তু একবারও হাত চালাচ্ছে না বা চালানোর চেষ্টাও করছে না। কখনও কখনও হাত দুটো দুদিকে নামিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করার সুযোগ করে দিচ্ছে, চেষ্টা করছে তাকে কাছে টেনে আনার। অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠছে ক্যান্নামের মুখে, কিন্তু লোভনীয় সুযোগগুলোকে কাজে লাগানোর এতটুকুও চেষ্টা করছে না সে।

দু মিনিট কেটে গেল এইভাবে। তারপরই প্যাটের শরীরে ফুটে উঠল একটা স্পষ্ট পরিবর্তন। প্রতিটা পেশী, মুখের প্রত্যেকটা রেখা যেন ঘোষণা করল— এইবার চরম আঘাত হানবার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত! নিপুণভাবে ভানটুকু ফুটিয়ে তুলল প্যাট। ওর শরীরটা এখন ইস্পাতের মতো কঠিন, নির্মম হয়ে উঠেছে। লক্ষ্য করে টানটান হয়ে উঠল ক্যান্নাম, চেষ্টা করল আরও সতর্ক হওয়ার। মুহূর্তের কৌশলে প্যাট ওকে ঠেলে নিয়ে গেল এক কোণে, সেইখানেই আটকে রাখল ওকে। তবু আঘাত হানছে না প্যাট, আঘাত করার চেষ্টাও করছে না। ক্যান্নাম উৎকণ্ঠিত। প্রচণ্ড চাপ পড়ছে ওর মনের ওপর। মরিয়া হয়ে কোণটা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল ও, পারল না। এই অবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জড়াজড়ি করে ফেলতে পারলে কিছুটা সময় হয়ত পাওয়া যেতে পারত, কিন্তু সাহস পেল না সে।

আর তখনই ঘটল মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাটা। পেশীর হিল্লোল তুলে পরপর কয়েকবার শরীরে মোচর দিল প্যাট। কেমন যেন ধাঁধায় পড়ে গেল ক্যান্নাম। দর্শকরাও বিমূঢ়। ঠিক কী ঘটেছিল, সে ব্যাপারে পরবর্তীকালে কোন দুজন দর্শকও একমত হতে পারে নি। মাথা নিচু করে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করল ক্যান্নাম, প্যাটের ভেল্কিতে সরিয়ে নিল মুখের সামনেকার হাতের আড়ালটাও। ভাবল, প্যাট বোধহয় নীচের দিক থেকে আঘাত হানতে চলেছে। আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যেই হাতটা সরিয়ে নিল ও। সরে যাওয়ারও চেষ্টা করল। রিং-এর কাছা-কাছি বসা দর্শকরা পরে হলফ করে বলেছিল—তারা দেখেছে প্যাটের ঘুষির প্রস্তুতিটা শুরু হয়েছিল ওর ডানদিক থেকে, তারপর সারা শরীরের জোরটা ঐ ঘুষির পিছনে ঢেলে দেওয়ার জন্য ও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হিংস্র শার্দুলের মতো। ঠিক কী যে ঘটেছিল তখন, বলা মুস্কিল। তবে এটা নিশ্চিত, ঠিক যে মুহূর্তে সরতে যাচ্ছিল ক্যান্নাম, সেই মুহূর্তেই ওর থুতনিতে এসে পড়েছিল প্যাট গ্রেগুনের

বজ্রমুষ্টি। তারপর? তারপর সেই একই দৃশ্য। ঠিক জিম হ্যানফোর্ডের মতোই শূন্যে ছিটকে উঠল ক্যাম্বামের জ্ঞানহীন শরীরটা, আছড়ে পড়ল রিং-এর দড়িতে, আর শেষমেষ দড়ি গলে গিয়ে পড়ল নিচে বসা সাংবাদিকদের ঘাড়ের ওপর।

তারপর সে রাতে সেই গোল্ডেন গেট এরিণায় ঠিক কী কী ঘটেছিল, পাতার পর পাতা জুড়ে প্রতিবেদন লিখেও তার যথাযথ বর্ণনা দিয়ে উঠতে পারেনি খবরের কাগজগুলো। তৎপর ছিল পুলিশ। রিং-এর মধ্যে কাউকে ঢুকতে দেয়নি তারা। কিন্তু হল্‌টাকে রক্ষা করার সাধ্য তাদের ছিল না। দাঙ্গা নয়, উন্মত্ত জনতা যেন এক উৎসবে মেতে উঠেছিল। অক্ষত রইল না একটা আসনও। প্রায় সবকটা কড়ি-কাঠ আর তক্তা খুলে উপড়ে তছনছ করে দেওয়া হল গোটা হল্‌টা। বাঁচার জন্য পুলিশের কাছে ছুটে গেল মুষ্টিযোদ্ধারা। কিন্তু সকলকে বাঁচানোর মতো পুলিশ কোথায়? জনতার হাতে বেধড়ক মার খেলো মুষ্টিযোদ্ধারা, ম্যানেজাররা আর প্রমোটাররা। বেঁচে গেল শুধু জিম হ্যানফোর্ড। ওর ফুলে ঢোল হয়ে ওঠা কালসিটে-পড়া মুখটা দেখেই যেন ওকে করুণা করল লোকে। হল্ থেকে বেরিয়ে জনতার রাগটা গিয়ে পড়ল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একখানা ঝকঝকে নতুন সাত হাজার ডলারের দামী মোটরগাড়ির ওপর। গাড়িটা জনৈক প্রমোটারের। চোখের পলকে ঝকঝকে গাড়িটা পরিণত হল কিছু ভাঙাচোরা লোহা আর চুল্লি জ্বালানোর কাঠে।

ড্রেসিং-রুম ভেঙে চুরমার। পোশাক পাল্টানোর কোন সুযোগই পেল না প্যাট। বাধ্য হয়ে লড়াইয়ের পোশাক পরেই বেরিয়ে এল ও, শরীরের ওপরে জড়িয়ে নিল একখানা বড় তোয়ালে, উঠে বসল নিজের গাড়িতে। কিন্তু এত করেও জনতার চোখকে ফাঁকি দেওয়া গেল না। এক দঙ্গল লোক চারদিক থেকে ঘিরে ধরল ওর গাড়িটা। পুলিস বাহিনী আপ্রাণ চেষ্টা করল ওকে রক্ষা করার। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে একটা রফার ব্যবস্থা করা গেল। গাড়িটা এগোল খুব আস্তে আস্তে, আর তার চারপাশ ঘিরে এগিয়ে চলল হাজার পাঁচেক উন্মত্ত, উৎফুল্ল মানুষ!

ইউনিয়ন স্কোয়ার পেরিয়ে এই ঝড় যখন সেন্ট ফ্রান্সিসের দিকে এগোচ্ছে, তখন মধ্যরাত্রি। জনতা চিৎকার করে আবার ভাষণ দিতে বলল প্যাটকে। হোটেলের দরজার কাছে এসে পড়েছে ওরা, তবুও পালানোর কোন সুযোগ পেল না প্যাট। ভক্তদের কাঁধের ওপর দিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পালানোর চেষ্টা পর্যন্ত করল ও, কিন্তু ফুটপাতে পা ঠেকানোর অবসরটুকুও মিলল না বরাতে। জনতা ওকে কাঁধে

তুলে নিল, অজস্র হাত ছুঁয়ে রইল ওকে, তারপর আবার এনে নামিয়ে দিল সেই মোটরের মধ্যে। সেইখানে দাঁড়িয়েই বক্তৃতা দিতে হল প্যাটকে। আর খানিকটা উঁচুতে এক জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মড গ্লেগুন দেখল—তার দয়িত, তার দুরন্ত হারকিউলিস, টানটান শরীরে উঠে দাঁড়িয়েছে মোটরের আসনের ওপর, অগুনতি মানুষের সামনে উজাড় করে দিচ্ছে তার কথার ডালি। ও শুনতে পেল ওর দয়িতের কথা—আমার জীবনের শেষ লড়াইটা আজ লড়ে এসেছি আমি, চির বিদায় জানিয়ে এসেছি বক্সিং-এর রিংকে! গর্বিতা মড গ্লেগুন জানে, আলাপের প্রথম থেকেই জানত, তার দুরন্ত হারকিউলিসের এই কথাটা বর্ণে বর্ণে কতখানি সত্য!

অথৈ জলের ডাক

প্রচুর গমের ভারে পাইরেনীস জাহাজের গলা পর্যন্ত চেপে বসেছে দরিয়ার জলে। খুব ধীব লয়ে দুলছে জাহাজটা। জাহাজটা নুয়ে থাকায় সুবিধেই হল মানুষটার। পালতোলা নৌকোটা থেকে সে সহজেই উঠে এল জাহাজে। ডেকের রেলিং-এর কাছে এসে জাহাজের খোলের দিকে তাকাল মানুষটা। খোলের মধ্যে কেমন এক আবছা, প্রায় চোখ জ্বালানো ধোঁয়াশা। ব্যাপারটা কি! ভারী অদ্ভুত তো! যেন চোখের পর্দায় আচমকা কোন দুর্বোধ্য চলচ্চিত্রের ঝলক। দৃষ্টি-বিভ্রান্তি? চোখের জমিন থেকে ছবিটা মুছে ফেলার চেষ্টা করল মানুষটা। আর সেইসঙ্গেই তার মনে হল,—বয়স বাড়ছে, এবার সান ফ্রান্সিসকো থেকে একটা চশমা আনানোর ব্যবস্থা করা দরকার।

রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে উঁচু মাস্তলটার দিকে তাকাল সে, তারপর চোখ রাখল পাম্পগুলোর দিকে। সব নিথর, অকেজো, যেন জাহাজটার সঙ্গে ওগুলোর কোন লেনদেন নেই। কিন্তু, জাহাজটার মাথায় ঐ বিপদ নিশানটা উড়ছে কেন? নিজের দ্বীপের খুশি-ভরা বাসিন্দাদের কথা মনে পড়ল তার। জাহাজে কারুর অসুখ-বিসুখ হয়নি নিশ্চয়ই—এমন একটা ভাবনাই প্রথমে ঘুরপাক খেল তার মাথায়। হয়ত পানীয় জল কিংবা খাবারের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। এগিয়ে এলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন, তাঁর সঙ্গে করমর্দন করল মানুষটা। ক্যাপ্টেনের মুখটা শুকনো, চোখে দুশ্চিন্তার ঘন ছায়া। দেখলেই বোঝা যায়, এক গভীর সঙ্কট তাঁর চারপাশে জমে উঠেছে। একটা হাল্কা গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। অনেকটা পোড়া রুটির মত, কিন্তু একটু যেন আলাদাও। গন্ধটা টের পাচ্ছিল আগন্তুক।

চারপাশে তাকাল সে। হাত বিশেক দূরে একজন নাবিক জাহাজের ফুটো মেরামত করছে। লোকটার সারা শরীরে প্রবল ক্লান্তির ছাপ। নাবিকটির দিকে চোখ রেখে এগোল আগন্তুক। হঠাৎই নাবিকটির হাতের নিচ থেকে উঠে এল অল্প একটু ধোঁয়া, তারপর পাক খেতে খেতে বাতাসে মিলিয়ে গেল। ততক্ষণে আগন্তুক পৌঁছে গেছে ডেকে। ডেকে পা রাখতেই তার খালি পায়ে যেন গরম কিছুর

ছ্যাকা লাগল, পায়ের শক্ত কড়াপড়া চামড়া ফুঁড়ে তাত যেয়ে পৌছল ভেতরে। পাইরেনীস জাহাজ কোন্ বিপদের মুখোমুখি, এক লহমায় তা বুঝে নিল আগন্তুক। চকিতে চোখ তুলল সে। খানিক দূরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে নাবিকরা, শুকনো, কালিপড়া ক্লান্ত চেহারা। ব্যগ্র চোখে তার দিকেই তাকিয়ে আছে ওরা। আগন্তুকের ঝকঝকে চোখ দুটোর গভীর থেকে যেন ছড়িয়ে পড়ছিল অভয়বানী ও সান্তনা। এক আশ্চর্য শান্তি ও নির্ভরতার ঘেরাটোপে ওদেরকে ঢেকে দিতে চাইল সেই দৃষ্টি।

'আগুন কদ্দিন ধরে জ্বলছে, ক্যাপ্টেন?'—আগন্তুক শুধোল। তার কণ্ঠস্বর শান্ত, নিরুদ্বেগ, যেন এক দিন-চরা ঘুঘুর গুঞ্জন।

চকিতে এক ঝলক শান্তি আর তৃপ্তির শীতল বাতাস খেলে গেল ক্যাপ্টেনের শরীরে। পরমুহূর্তেই নিজের মান-মর্যাদার কথাটা ভেসে উঠল তাঁর মন-পর্দায়। নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন তিনি। পুরোনো সূতীর জামা আর রংচটা জীর্ণ ট্রাউজার পরা একটা লোক, সম্ভবত উঞ্ছবৃত্তিই যার জীবিকা, তার কাছে শান্তি আর তৃপ্তি খুঁজতে চাইছে তাঁর ক্লান্ত, চিন্তা ভারাক্রান্ত আত্মা? কেন? কারণটা জানা নেই ক্যাপ্টেনের। শুধু এক অজানা আবেগের তীক্ষ্ণ খোঁচায় নিজের ওপর বিরক্ত বোধ করছেন তিনি!

'পনের দিন ধরে'—ক্যাপ্টেনের ছোট্ট জবাব, এবং জিজ্ঞাসা, 'কিন্তু আপনি কে?'

'আমার নাম ম্যাকয়', আগন্তুকের কণ্ঠস্বর কোমল, সহানুভূতির ছোঁয়া-লাগা।

'আপনি কি পাইলট?' ক্যাপ্টেনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আর একটি লোক, লম্বা, কাঁধচওড়া বিশাল চেহারা, চোখ-মুখ বসে গেছে, দাড়িতে ক্ষুর পড়ে নি অনেক দিন! প্রশ্নটা তারই।

শান্ত চোখে লোকটির দিকে তাকাল ম্যাকয়, 'কোন জাহাজী পাইলটের থেকে আমি অবশ্য কম যাই না। আসলে এখানে আমরা সবাই পাইলট। এই দরিয়ার জলের প্রতিটা ইঞ্চি আমার চেনা।'

ক্যাপ্টেন অধৈর্য হয়ে উঠছেন, 'আমি কিন্তু এখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে চাইছি! এক্ষুনি।'

'তাহলে আমার সঙ্গেই কথা বলুন।'

ক্যাপ্টেনের বুকের গভীরে আবার সেই শান্তির দোলা, অথচ পায়ের নিচে জাহাজটা এখন আগুনের হল্কায় ফুঁসছে! ভ্রু দুটো কুঁচকে গেল ক্যাপ্টেনের। শরীরে প্রচণ্ড অস্থিরতা। হাত মুষ্টিবদ্ধ, যেন এখনই আঘাত হানবে।

'তা, আপনি কোন্ মহাশয় ব্যক্তি, জানতে পারি কি ?' ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করেন।
কোমল, নম্র গলায় উত্তর দিল ম্যাকয়, 'আমিই এখানকার চিফ ম্যাজিস্ট্রেট।'
ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়ানো লম্বা লোকটি হাত ছড়িয়ে খ্যা-খ্যা করে হেসে উঠল, যেন খুব মজা পেয়েছে ম্যাকয়ের কথায়। কিন্তু সে হাসিতে মজার থেকেও বেশি করে ফুটে উঠছিল হিস্টিরিয়ার লক্ষণ। তার আর ক্যাপ্টেনের চোখে সুস্পষ্ট অবিশ্বাস, বিস্ময়। এই নগ্নপদ, উঞ্ছজীবী চেহারার লোকটা এত বড় মর্যাদার অধিকারী ? ভাবা যায় ? পরনে সুতীর ছেঁড়াখোড়া জামা, একটা ঘাটেও বোতাম লাগানো নেই, বোঝাই যাচ্ছে ভেতরে কোন অন্তর্বাস জাতীয় বস্তুও নেই। জামার নিচে রোদে পোড়া চওড়া বুক, মাথায় একটা জরাজীর্ণ খড়ের টুপি, তাতে ধূসর-রঙা কর্কশ চুলের সবটুকু ঢাকা পড়েনি ! বুকের আধাআধি পর্যন্ত নেমে এসেছে একরাশ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। যে-কোন জামাকাপড়ের দোকানে গেলে ওর সমস্ত পোশাকটা স্রেফ গোটা দুয়েক শিলিং-এর বদলেই মিলে যাবে।
নরমগলায় ক্যাপ্টেন জানতে চাইলেন, 'বাউন্টি জাহাজের সেই ম্যাকয় কি আপনার কেউ হতেন ?'
'তিনি আমার প্রপিতামহ।'
'আ-চ্ছা', বলতে বলতে নিজেকে সংযত করে নিলেন ক্যাপ্টেন, 'আমার নাম ড্যাভেন্পোর্ট, আর ইনি হচ্ছেন আমাদের ফার্স্ট মেট মিস্টার কনিগ্।'
কনিগের সঙ্গে করমর্দন করল ম্যাকয়।
'এবার তাহলে কাজের কথায় আসা যাক', ক্যাপ্টেনের গলায় ব্যস্ততা, 'দিন পনের ধরে আমাদের জাহাজে আগুন জ্বলছে। যে-কোন মুহূর্তে সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। সেইজন্যেই আমাকে এই পিট্কেয়ার্ন দ্বীপে আসতে হয়েছে। এখন জাহাজটাকে তীরে নিয়ে যেতে পারলেই হয়, কিম্বা এটাকে ডুবিয়ে দিয়ে কাঠামোটাকে বাঁচাতে পারলেও আপত্তি নেই।'
ম্যাকয় বলল, 'আপনি একটা ভুল করেছেন, ক্যাপ্টেন। আপনার উচিত ছিল আস্তে আস্তে ম্যাঙ্গারেভা দ্বীপের দিকে এগিয়ে যাওয়া। ওখানে একটা লেগুন আছে, জলটা চমৎকার, আর তার পাশেই দীর্ঘ সুন্দর একটা বেলাভূমিও পেতেন।'
'তা আমরা না-হয় ওখানে না গিয়ে এখানেই এসেছি। তাতে ক্ষতিটা কী ?' চীৎকার করে ওঠে ফার্স্ট মেট কনিগ্।
'ঠিক। আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি, এখানেই একটা কিছু করা দরকার', ক্যাপ্টেন জানান।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে ম্যাকয়, 'এখানে আপনারা কিছুই করতে পারবেন না ' এখানে কোন বেলাভূমি নেই, এমনকি আপনাদের এই জাহাজের নোঙর বাঁধারও কোন জায়গা নেই।'

'আপনি আমাদের বোকা বানাতে চাইছেন? গবেট ঠাউরেছেন আমাদের?' চিৎকার করে উঠল কনিগ্। হাত তুলে তাকে শান্ত হওয়ার ইঙ্গিত করলেন ক্যাপ্টেন। কনিগ্ অদম্য, 'ও-সব কথায় আমাকে ভোলাতে পারবেন না। আচ্ছা, বলুন তো, নিজেদের নৌকোগুলোকে, মানে স্কুনার বা কাটার, কিংবা অন্য যা-কিছুই হোক—সেগুলোকে রাখেন কোথায়? কি, জবাব দিন!'

এক টুকরো হাসি ফুটল ম্যাকয়ের ঠোঁটে। শান্ত, মিষ্টি হাসি। সে হাসি যেন ক্লান্ত কনিগ্‌কে টেনে নিতে চাইল এক প্রশান্তি আর নির্ভরতার জগতে। ম্যাকয় বলল, 'আমাদের কোন স্কুনার কিম্বা কাটার নেই। আমাদের শালতিগুলোকে আমরা বয়ে নিয়ে রেখে আসি পাহাড়ের ধারে।'

কনিগের গলায় ব্যঙ্গ ফুটল, 'যা-হোক একটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন, অ্যাঁ? বলি, অন্য দ্বীপ-টীপে আপনারা যান কী করে? কৈ, উত্তর দিন।'

'আমরা কোথাও যাই না। তবে পিটকেয়ার্নের গভর্নর হিসেবে আমাকে অবশ্য মাঝে-মধ্যে যেতে-টেতে হয়। অল্পবয়সে আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি। কখনো-কখনো সওদাগরি স্কুনারে চেপে যেতুম বটে, কিন্তু বেশিরভাগ ঘোরাঘুরিটাই করেছি মিশনারিদের জাহাজে। সে জাহাজ এখন আর এ-তল্লাটে আসে না। এখন তাই যে-সব জাহাজ এখান দিয়ে যাতায়াত করে, সেগুলোই ভরসা। অনেক সময় বছরে খান ছয়েক জাহাজও এসে পড়ে, আবার কখনো হয়ত এক-দেড় বছরে একটা জাহাজও আসে না। আজ থেকে সাত মাস আগে শেষ জাহাজটা এসেছিল, তারপর এই আপনারা এলেন।'

'তার মানে বলতে চান....' ফার্স্ট মেট কিছু বলার জন্য মুখ খোলে। তাকে থামিয়ে দেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট, 'থাক, খুব হয়েছে। মিছিমিছি সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তাহলে মিস্টার ম্যাকয়, এখন কী করা যায়?'

তীরের দিকে চোখ ফেরাল বৃদ্ধ মানুষটি, তার বাদামী চোখে যেন কোন নারীর চোখের স্নিগ্ধতা। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ক্যাপ্টেন আর মেটও তাকাল পিটকেয়ার্নের নিঃসঙ্গ পাহাড়টার দিকে। চোখ ফেরাল ম্যাকয়, জাহাজের নাবিক আর খালাসীদের দিকে তাকাল। উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতীক্ষা করছে ওরা। কোনরকম তাড়াহুড়ো করল না সে। ধীরে-সুস্থে, গুছিয়ে ভাবতে লাগল।

তার চিন্তাভাবনায় এক আশ্চর্য প্রত্যয়। জীবনের অজস্র ঘাত-প্রতিঘাতেও কখনো এই প্রত্যয় ভেঙে পড়ে নি।

অবশেষে কথা বলল ম্যাকয়, 'এখন হাওয়ার তেমন জোর নেই। একটা তীব্র স্রোত পশ্চিমমুখো বইছে।'

'ঐ স্রোতই তো আমাদের তীরের দিকে ঠেলে এনেছে',—বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন, যেন ম্যাকয়েব সামুদ্রিকজ্ঞানের সত্যতা প্রমাণ করতে চাইলেন।

ম্যাকয় বলে চলল, 'হুঁ, তা এনেছে বটে। শুনুন, আজ আর এই স্রোত ঠেলে এগোতে পারবেন না। আর যদি পারেনও, তাহলেও কাছাকাছি কোন বেলাভূমি পাবেন না। গোটা জাহাজটার সর্বনাশ হয়ে যাবে একেবারে।'

চোখ-ভরা হতাশা নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন আর মেট।

ম্যাকয় বলল, 'যা বলি, শুনুন। আজ মাঝরাত্তির নাগাদ মনে হচ্ছে বেশ জোরে হাওয়া বইতে শুরু করবে। মেঘের অবস্থাটা দেখুন। ঐ যে, উজানের দিকে দেখুন, কেমন ঘন মেঘ জমছে! ঐদিক থেকেই হাওয়াটা আসবে, ঐ দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে। ম্যাঙ্গারেভা এখান থেকে ঠিক তিনশ মাইল দূরে। ঐখানেই পাড়ি জমান। আপনাদের জাহাজের পক্ষে ওটাই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা।'

ফার্স্ট মেট মাথা নাড়ল। ক্যাপ্টেন বললেন, 'কেবিনে আসুন, ম্যাপটা দেখা যাক একবার।'

কেবিনের মধ্যে ঢুকে যেন দমবন্ধ হয়ে এল ম্যাকয়ের। কেমন যেন দমবন্ধ বিষাক্ত পরিবেশ। অদৃশ্য কোন গ্যাস যেন ঝাপট মারছে ওর চোখে মুখে। জ্বালা করছে চোখ দুটো। মেঝেটা গরম, ভীষণ গরম। খালি পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব। সারা শরীর থেকে ঘাম ঝরছে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে চারপাশটা দেখল ম্যাকয়। আশ্চর্য, এত গরম! গোটা কেবিনটা যে এখনও ফেটে চৌচির হয়ে যায় নি, এ-ই যথেষ্ট। ওর মনে হল যেন কোন রুটি-সেঁকার চুল্লির ওপর বসে আছে ও, যেখানে যে-কোন মুহূর্তে তাপটা ভয়ঙ্কররকম তীব্র হয়ে উঠে একটা তৃণখণ্ডের মত পুড়িয়ে ছাই করে দেবে ওকে।

মেঝে থেকে একটা পা তুলে নিয়ে অন্য পায়ের ট্রাউজারে গোড়ালিটা ঘষল ম্যাকয়। সেদিকে তাকিয়ে রুক্ষ ভঙ্গীতে হেসে উঠল মেট, বলল, 'জাহান্নমের ওপরতলার ঘর এটা, বুঝলেন! আপনার পায়ের ঠিক নিচেই জ্বলছে জাহান্নমের আগুন!'

'বড্ড তাত'—চিৎকারটা যেন আপনা থেকেই লাফিয়ে উঠল ম্যাকয়ের গলায়।

একটা রুমাল বার করে মুখটা মুছতে শুরু করল ও।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে, ম্যাপের শাদা রঙের মাঝখানে একটা কালো ফুটকির দিকে আঙুল দেখিয়ে ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন, 'এই যে, এইটা হচ্ছে ম্যাঙ্গারেভা! আর এইখানটাতে, মানে মাঝামাঝি জায়গায়, আরেকটা দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি। আমরা তো এই দ্বীপটাতেও যেতে পারি, নাকি?'

ম্যাপের দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিল ম্যাকয়, ওটা হচ্ছে ক্রেসেণ্ট আইল্যাণ্ড। দ্বীপটায় কোন লোকজন থাকে না। তাছাড়া ওটা জল থেকে মাত্র দু-তিন ফুট উঁচু। লেগুন আছে বটে, কিন্তু তাতে ঢোকার কোন পথ নেই। আপনাদের জাহাজের পক্ষে ম্যাঙ্গারেভাই এখন সবথেকে কাছের নিরাপদ আশ্রয়।'

ক্রুদ্ধকণ্ঠে কিছু-একটা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল মেট, তাকে থামিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট, 'বেশ, ম্যাঙ্গারেভাই সই। নাবিকদের ডেকে পাঠান, মিস্টার কনিগ্।'

ডেকের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল নাবিকরা, উৎকন্ঠিত, চটপট কাজ করার ক্লান্তিকর প্রচেষ্টার ছাপ ওদের চোখে-মুখে। চলাফেরাতেও ফুটে উঠছে ক্লান্তি। কথা শোনার জন্য রসুইঘর থেকে বেরিয়ে এল জাহাজের রাঁধুনী, তার পাশে এসে দাঁড়াল জাহাজের কেবিন-বয়টিও।

পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট। তারপর জানালেন—জাহাজ এখন ম্যাঙ্গারেভার দিকে যাবে। একটা গর্জন উঠল নাবিকদের মধ্যে থেকে। চারপাশে কর্কশ চিৎকার, অস্ফুট গলায় ক্ষিপ্ত প্রতিবাদ, শাপশাপান্ত, গালিগালাজ। সবকিছু ছাপিয়ে লাফিয়ে উঠল একটা তীক্ষ্ণ গলা, 'হায় ভগমান! পনর দিন ধরে ঠায় এই নরকের মধ্যে বসে রইছি আমরা। অ্যাখন ফের এব এই নরককে সাথে নিয়ে দরিয়ায় ভাসতে বলছে আমাদের!'

নাবিকদের থামাতে পারলেন না ক্যাপ্টেন। এগিয়ে এল ম্যাকয়। ওর প্রশান্ত, নিরুদ্বেগ উপস্থিতিটাই যেন শান্তির তুলি বুলিয়ে দিল নাবিকদের শরীরে। থেমে গেল চিৎকার, বন্ধ হল শাপশাপান্ত। শুধু দু'একজন উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল ক্যাপ্টেনের দিকে। ক্যাপ্টেনতখন দূরমনস্ক। পিটকেয়ার্ণের সবুজে সবুজ পাহাড়-চূড়া আর স্বপ্নঘেরা তটভূমির দিকে তাকিয়ে আছেন ড্যাভেনপোর্ট, আকুল, নির্নিমেষ।

ম্যাকয়ের গলায় বাসন্তী হাওয়ার কাঁপন, 'ক্যাপ্টেন, আমি যেন শুনলুম ওরা নাকি ক'দিন কিছু খেতে পায়নি!'

'সত্যিই পায় নি', বললেন ক্যাপ্টেন, 'আমরা কেউই পাই নি। গত দুদিনে আমি শুধু একটা বিস্কুট আর এক চামচে স্যামন মাছ খেয়েছি! যেটুকু খাবার আছে, সেটুকু ভাগাভাগি করে খাচ্ছি আমরা। আসলে আগুনটা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা নেভাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম সবাই। তারপর দেখি ভাঁড়ারে খাবার প্রায় শেষ। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ক্ষিদের কথা বলছেন? আমিও ঠিক ওদের মতই ক্ষুধার্ত।'

আবার নাবিকদের দিকে ফিরে কথা বলতে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন। আবার শুরু হল কর্কশ চিৎকার, শাপশাপান্ত। চরম ক্রোধে পাশবিক হয়ে উঠেছে ওদের মুখগুলো। ততক্ষণে সেকেণ্ড আর থার্ড মেটও এগিয়ে এসেছে ক্যাপ্টেনের পাশে। পাটাতনের পাশটায় দাঁড়িয়েছে ওরা, চোখমুখ স্থির, অভিব্যক্তিহীন। নাবিকদের এই বিদ্রোহে ওরা যেন বিরক্ত। জিজ্ঞাসু চোখে ফার্স্ট মেটের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। কাঁধ ঝাঁকিয়ে কনিগ্ বোঝাতে চাইলেন—কিছু করার নেই। ম্যাকয়ের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, 'দেখুন, এই নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে, একটা জলন্ত জাহাজে চড়ে সমুদ্রে ভেসে পড়তে নাবিকদের তো আর বাধ্য করতে পারি না! দু সপ্তাহ ধরে এই ভাসন্ত কফিনে দিন কাটাচ্ছে ওরা। ওরা ক্লান্ত. খাওয়া জুটছে না। ঢের হয়েছে, আমরা পিটকেয়ার্নেই যাব।'

'কিন্তু বাতাস তখন কমজোরি, জাহাজের তলদেশের অবস্থাও করুণ। দুর্বার পশ্চিমা স্রোত ঠেলে এগোতে পারল না পাইরেনীস। দু'ঘণ্টা চেষ্টা করে দেখা গেল—তিন মাইল পিছিয়ে পড়েছে জাহাজটা। জান লড়িয়ে চেষ্টা করছিল নাবিকরা, যেন গায়ের জোরে উজান ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল জাহাজটাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে, ডাইনে-বাঁয়ে টাল খেতে খেতে, পশ্চিমদিকে ভেসে চলল পাইরেনীস! ক্যাপ্টেন অস্থির। উত্তেজনায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন ক্রমাগত। মাঝে-মাঝে থামছেন, চোখ রাখছেন ধোঁয়ার কুণ্ডলী তার উৎসের দিকে। ডেকের নানান ছিদ্র দিয়ে উঠে আসছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ছুতোর-মিস্ত্রি আঁতি-পাঁতি করে ঐ-সব ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর কোন ছিদ্র চোখে পড়লেই তা বুজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

অবশেষে জিজ্ঞাসু চোখে ম্যাকয়ের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট, 'কী বুঝছেন?' চোখ-জোড়া শিশুর কৌতূহল নিয়ে ছুতোরের কাজ দেখছিল ম্যাকয়। চোখ ফিরিয়ে তীরের দিকে তাকাল ও। ঘন কুয়াশার আড়ালে অস্পষ্ট হয়ে আসছে তীরভূমি।

'আমার মতে এবার ম্যাঙ্গারেভার দিকেই যাওয়া দরকার। যে হাওয়াটা আসতে চলেছে, তার জোরে আগামীকাল সন্ধ্যে নাগাদই ওখানে পৌঁছে যাওয়া যাবে।'

'কিন্তু আগুনটা যদি তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে? যে-কোন মুহূর্তেই আগুনটা ছড়িয়ে যেতে পারে।'

'আপনাদের বোটগুলো তৈরী রাখুন। জাহাজটা অকেজো হয়ে গেলে ঐ হাওয়াই বোটগুলোকে ম্যাঙ্গারেভায় পৌঁছে দেবে।'

দু'এক মুহূর্ত কোন ভাবনার গভীরে তলিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট। তারপর উচ্চারণ করলেন সেই অবধারিত প্রশ্নটা, যা শোনার ইচ্ছে ম্যাকয়ের ছিল না। তবু ও জানত—এ প্রশ্ন উঠবেই।

'আমার কাছে ম্যাঙ্গারেভার কোন ম্যাপ নেই। সাধারণ ম্যাপে শুধু একটা ফুটকি দেওয়া আছে। লেগুনে ঢোকার রাস্তা তো আমি খুঁজে পাব না। তাই বলছি, আপনি কি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন?'

ম্যাকয় স্থির, অচঞ্চল, যেন কোন ডিনারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছে, 'হ্যাঁ ক্যাপ্টেন, আমি যাব।'

আবার সব নাবিকদের ডাকা হল ডেকে। পাটাতনের ওপরে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'জাহাজটা পারে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা, কিন্তু পারি নি। প্রবল স্রোত। এই মাননীয় ভদ্রলোকের নাম ম্যাকয়, উনি পিটকেয়ার্ন দ্বীপের চিফ ম্যাজিস্ট্রেট এবং গভর্নর। উনিও আমাদের সঙ্গে ম্যাঙ্গারেভায় যাবেন। কাজেই বুঝতে পারছ, অবস্থা খুব গুরুতর কিছু নয়। উনি যদি বুঝতেন এ জাহাজে গেলে জীবনের ঝুঁকি আছে, তাহলে কি যেতেন? তাছাড়া উনি নিজে যেচেই যেতে চাইছেন। তাহলে আমাদেরই বা যেতে ভয়টা কিসের? তা, তোমরা কী বলছ? ম্যাঙ্গারেভায় যাওয়া হবে?'

না, এবার আর কোন চিৎকার শোনা গেল না। ম্যাকয়ের উপস্থিতি, তার শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়া এক নির্ভরতা আর প্রশান্তির আভা নাবিকদের মনে দাগ কাটল। চাপাগলায় একে অপরের সঙ্গে কথা বলল তারা। কোন রকম উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই, মতবিরোধ নেই। সকলেই একমত। একজনকে তারা ভার দিল নিজেদের সিদ্ধান্তটা ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে দেওয়ার। একটু এগিয়ে এল সেই লোকটা, নিজের আর নিজের সাথীদের বীরত্বের গর্বে ডগোমগো। চিৎকার করে জানাল সে, 'শুনুন, উনি যদি যান, তাহলে আমরাও যাব।'

অন্য নাবিকরাও বিড় বিড় করে সম্মতি জানাল, তারপর পা বাড়াল সামনে।

মেটকে কিছু একটা নির্দেশ দিতে যাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন, ঠিক তখনই শোনা গেল ম্যাকয়ের গলা, 'ক্যাপ্টেন, রওনা হবার আগে আমাকে একবার তীরে যেতে হবে।'

যেন বাজ পড়ল জাহাজে। বোবা চোখে ম্যাকয়ের দিকে তাকাল কনিগ, যেন সামনে কোন বদ্ধ উন্মাদকে দেখছে।

'তীরে যাবেন?' ক্যাপ্টেন যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, 'কেন? আপনার ঐ শালতিতে চড়ে তীরে যেতে তো তিন ঘণ্টা লেগে যাবে!'

তীরের দিকে চোখ রেখে দূরত্বটা মেপে নিল ম্যাকয়, তারপর ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ, তা লাগবে। এখন ছটা বাজে, নটার আগে আমি ওখানে পৌঁছতে পারব না। তারপর সব লোকজনকে ডেকে জড়ো করতে দশটা বেজে যাবে। আজ রাতে হাওয়ার বেগ বাড়বে, কাজেই চিন্তার কিছু নেই, কাল সকালে একটু এগিয়ে গিয়ে আমাকে তুলে নেবেন জাহাজে।'

ক্যাপ্টেন উত্তেজনায় ধৈর্যহারা, 'আশ্চর্য, সব লোককে হঠাৎ জড়ো করতে যাবেন কেন? আমার জাহাজটা যে ঠিক এই পায়ের নিচেই জ্বলছে, সেটা বুঝতে পারছেন না?'

ম্যাকয় স্থির, অচঞ্চল, যেন গ্রীষ্মের সমুদ্র। ক্যাপ্টেনের উত্তেজনায় এতটুকু আলোড়নও জাগল না সেই সমুদ্রের জলরাশিতে। একান্ত স্বাভাবিক গলায় কথা বলল ম্যাকয়, 'হ্যাঁ ক্যাপ্টেন, আমি বুঝতে পারছি আপনার জাহাজটা জ্বলছে। আর বুঝতে পারছি বলেই আপনাদের সঙ্গে ম্যাঙ্গারেভায় চলেছি। কিন্তু যাওয়ার আগে আমাকে অনুমতি নিয়ে আসতে হবে। এটাই এখানকার রীতি। গভর্নরের দ্বীপ ছেড়ে যাওয়াটা খুবই জরুরী ব্যাপার, কারণ তার সঙ্গে এখানকার বাসিন্দাদের ভালমন্দের প্রশ্নটা জড়িত। কাজেই এ ব্যাপারে মত দেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার তাদের আছে। হয় তারা যাওয়ার অনুমতি দেবে, অথবা প্রস্তাবটা বাতিল করে দেবে। তবে আমি জানি, অনুমতি ওরা দেবেই।'

'আপনি নিশ্চিত?'

'পুরোপুরি নিশ্চিত।'

'তাহলে যখন জানেনই যে ওরা অনুমতি দেবেই, তাহলে আর তার জন্য যাওয়ার দরকারটা কী? ভেবে দেখুন, পুরো একটা রাত দেরি হয়ে যাবে।'

'এটা আমাদের রীতি', ম্যাকয়ের অবিচলিত উত্তর, 'তাছাড়া, আমি এখানকার গভর্নর। আমার অনুপস্থিতিতে দ্বীপের সবকিছু যাতে ঠিকঠাক চলে, তার জন্যেও ব্যবস্থা করে যাওয়া দরকার।'

ক্যাপ্টেন নাছোড়, 'কিন্তু ম্যাঙ্গারেভা তো এখান থেকে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার পথ! না-হয় ধরে নিচ্ছি উজান ঠেলে ফিরে আসতে আপনার তার থেকে ছ'গুণ বেশি সময় লাগবে। অর্থাৎ এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনি দ্বীপে ফিরে আসতে পারবেন! ম্যাকয়ের মুখে সেই সদাশয় হাসি, 'খুব কম জাহাজই পিটকেয়ার্নে আসে, ক্যাপ্টেন। আর আসেও সাধারণত সান ফ্রান্সিসকো কিংবা ঐ-রকম কোন জায়গা থেকে। ছ'মাসের মধ্যে ফিরতে পারলে বরাতজোর বলে জানব। হয়ত গোটা একটা বছরই বাইরে থাকতে হবে, ফেরার জাহাজ পাওয়ার জন্যে হয়ত বা সান ফ্রান্সিসকোতেও যেতে হতে পারে। আমার বাবা একবার মাস তিনেকের জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন, কিন্তু পিটকেয়ার্নে ফিরে আসতে তাঁর পাক্কা দু'বছর সময় লেগেছিল। তাছাড়া, আপনাদের খাবারও প্রায় ফুরিয়েছে। শেষ পর্যন্ত যদি জাহাজ ছেড়ে বোটে করে যেতে হয় আর আবহাওয়া যদি বেতাল হয়ে ওঠে, তাহলে ডাঙ্গায় পৌঁছতে বেশ কয়েক দিন লেগে যেতে পারে। তীরে গেলে সকালে ফেরার সময় আমি দু শালতি ভর্তি খাবার নিয়ে আসতে পারব। শুকনো কলাই সবথেকে ভাল। হাওয়ার বেগ বাড়লে জাহাজটা এগিয়ে নিয়ে যাবেন। যত কাছে যেতে পারবেন, তত বেশি খাবার নিয়ে আসা যাবে। আচ্ছা, এখন তাহলে চলি। বিদায়।'

হাতটা বাড়িয়ে দিল ম্যাকয়। তার সঙ্গে করমর্দন করলেন ক্যাপ্টেন, পরম অনিচ্ছায়। তাঁর হাতে এখন একজনের হাত নয়, যেন কোন ডুবন্ত নাবিকের হাতের মুঠোয় লাইফবোটের কিনারা। ক্যাপ্টেন শুধোলেন, 'আপনি যে সত্যিই সকালে ফিরে আসবেন, তা জানব কী করে?'

মেট চিৎকার করে উঠল, 'ঠিক, ঠিক! উনি যে নিজের জান বাঁচানোর জন্যে পালাচ্ছেন না, তা আমরা বুঝব কী করে?

ম্যাকয় নির্বাক। শুধু ওর দু'চোখে এক কোমল আভা, সহৃদয় পরশ। ওর ঐ চাউনি জাহাজীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিল পরম নির্ভরতার আশ্বাস।

ম্যাকয়ের হাতটা ছেড়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। শেষবারের মত আশ্বাসভরা চোখে নাবিকদের দিকে একবার তাকাল ও, তারপর রেলিং পেরিয়ে নেমে গেল নিজের শালতিতে।

বাতাস এখন তাজা, বেগবান। খোলের মধ্যে আগুন নিয়েও পশ্চিমা স্রোত ঠেলে মাইল ছয়েক এগিয়ে এসেছে পাইরেনীস। আর মাইল তিনেক দূরেই দেখা যাচ্ছে পিটকেয়ার্নের তটভূমি. ঘুম ভাঙছে সূর্যের, দরিয়ার বুকে তার লালচে আলোর ছটা। সেই ঘুম-ভাঙা সকালী আলোয় ছুটে শালতিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট : আবার জাহাজে উঠল ম্যাকয়, রেলিং পেরিয়ে পা রাখল উত্তপ্ত ডেকে। দু শালতি ভর্তি শুকনো কলা নিয়ে এসেছে ও। শুকনো পাতা দিয়ে মোড়া রয়েছে কলাগুলো।

মিনিট খানেক পর। জাহাজের পিছিলে মানে পেছনের ডেকে ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়িয়েছিল ম্যাকয়. জাহাজের গতির পরিমাপ করছিলেন ক্যাপ্টেন। ম্যাকয় বলল, 'ক্যাপ্টেন, এবার তাহলে জীবনের জন্য দৌড় শুরু হল। দেখুন, আমি কিন্তু নাবিক নই। ম্যাঙ্গারেভা পর্যন্ত আপনাকেই চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আপনি ডাঙ্গার কাছ পর্যন্ত নিয়ে চলুন, তারপর লেগুনের মধ্যে জাহাজ ঢোকানোর দায়িত্ব আমার। আচ্ছা, এখন কত গতিতে চলছে জাহাজটা?'

হু-হু করে পিছন দিকে ছুটে যাওয়া জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন জানালেন, 'এগার নট।'

'এগার? বেশ. এই গতিতে চলতে পারলে আগামীকাল সকাল আটটা থেকে নটার মধ্যেই ম্যাঙ্গারেভার তটভূমি চোখে পড়বে। দশটা, বড়জোর এগারটার মধ্যেই জাহাজটাকে একেবারে ভেতরে নিয়ে যেতে পারব আশা করছি। ব্যস, মুস্কিল আসান।'

ম্যাকয়ের কথায় এক সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের দোলা। ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্টের মনে হল, মুক্তির সেই পরম লগ্ন যেন এসেই গেছে। প্রায় দিন পনের ধরে এই অগ্নিময় জাহাজকে চালিয়ে নিয়ে আসার ভয়ঙ্কর চাপ সহ্য করতে হচ্ছে তাঁকে। আর যেন সামাল দিতে পারছেন না ক্যাপ্টেন।

এক ঝলক দমকা হাওয়ার ঝাপট লাগল তাঁর শরীরে, শন্‌শন বাতাসী শিস,

ছুঁয়ে গেল তাঁকে। বাতাসের গতিবেগটা মনে মনে হিসেব করার চেষ্টা করলেন ক্যাপ্টেন, তারপর চকিতে পাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'ঝোড়ো হাওয়ার তো কামাই নেই। জাহাজটা এখন এগারর বদলে প্রায় বারোয় চলছে। এভাবে চলতে পারলে আমরা আজ রাতেই পৌছে যাব মনে হচ্ছে।'

একরাশ আগুন বুকে নিয়ে, ঢেউজাগা সাগরের নীলাভ আস্তর চিরে, সারাটা দিন ছুটে চলল পাইরেনীস। তারপর দরিয়ার ওপর চেপে বসল আঁধারী রাত। জাহাজের বড় বড পালগুলো টাঙিয়ে দেওয়া হল। গভীর অন্ধকার ভেদ করে, ফুঁসে-ওঠা গর্জমান তরঙ্গরাশির সঙ্গী হয়ে, পাইরেনীস ছুটে চলল তার মুক্তির ঠিকানায়। অনুকূল বাতাস বাড়িয়ে দিয়েছে বন্ধুত্বের হাত। সবার মনেই চাপা আনন্দ, স্বস্তির আবহাওয়া বিরাজ করছে জাহাজজুড়ে। দ্বিতীয় প্রহরে কে একজন গান ধরল। ছড়িয়ে পড়ল সুরের রেশ। একসময় দেখা গেল, জাহাজের সমস্ত নাবিকই গান গাইছে খোশমেজাজে।

ডেকের ওপর কম্বল ছড়িয়ে বসে ছিলেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট। পাশে ম্যাকয়। ক্যাপ্টেন বললেন, 'ঘুম কাকে বলে, ভুলেই গেছি। এখন একটু গড়িয়ে নিই। তবে প্রয়োজন মনে করলেই ডাকবেন কিন্তু আমাকে।'

রাত তিনটে নাগাদ বাহুতে একটা স্পর্শ পেয়ে ঘুম ভাঙল ক্যাপ্টেনের। ধড়মড করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, চোখে এখনও ঘুমের রেশ। তাকালেন দূরে····দূরে ঐ ছায়া-ছায়া দিগন্তের ইঙ্গিত। চারপাশে হাওয়ার মাতন, যেন রণসঙ্গীত বেজে চলেছে একটানা, আর উন্মত্ত সমুদ্রের দাপাদাপি। দোদুল দোলায় দুলছে পাইরেনীস। ডেকের রেলিং ছুঁয়ে যাচ্ছে একের পর এক ঢেউ। চিৎকার করে কী-যেন বলছে ম্যাকয়, শুনতে পাচ্ছেন না ক্যাপ্টেন। এগিয়ে গিয়ে ম্যাকয়ের কাঁধে হাত রাখলেন তিনি, তাকে টেনে নিয়ে এলেন নিজের কাছে, তারপর কান পাতলেন তার ঠোঁটের সামনে—নাহলে কথা শোনার কোন উপায় নেই।

'এখন তিনটে বাজে', জানাল ম্যাকয়। সেই কোমল, মিষ্টি স্বর, শুধু একটু চাপা, যেন ভেসে আসছে বহু দূর পাড়ি দিয়ে, 'আমরা আড়াইশ মাইল পেরিয়ে এসেছি। ক্রেসেন্ট আইল্যাণ্ড আর তিরিশ মাইল দূরে। এই সামনেই কোথাও হবে। ওখানে কোন আলোর ব্যবস্থা নেই। এভাবে ছুটে চললে ঐ দ্বীপে ধাক্কা লেগে জাহাজটা চুরমার হয়ে যাবে। আমরাও বাঁচতে পারব না।'

'তা, আপনি কী বলেন? নোঙর করব?'

'হ্যাঁ, নোঙর ফেলতে বলুন। দিনের আলো ফুটলে জাহাজ ছাড়া হবে। এমন

কিছু না, বড়জোর ঘণ্টা চারেক দেরী হতে পারে।'

নোঙর করল পাইরেনীস। বুকের গভীরে আগুন, পাগ্‌লা হাওয়ার কামড়, মাতাল সমুদ্রের ফুঁসে-ওঠা ঢেউয়ের ঝাপট—তিন দুশমনের মোকাবিলায় ব্যস্ত। যেন একটা অগ্নিময় খোলা, ভাসছে ঢেউয়ের তাথৈ দোলায়, আর সেই খোলার বাইরের দিকে দাঁড়িয়ে হাতের মুঠোয় জীবন নিয়ে মরনপণ যুঝে চলেছে কিছু লড়াকু মানুষ। বুকভরা আগুন নিয়ে পাইরেনীস ভাসছে।

'এই ঝড়টা মোটেই স্বাভাবিক নয়, বুঝলেন', কেবিনে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলছিল ম্যাকয়, 'বছরের এ সময়টায় সাধারণত কোন ঝড়-টড় ওঠে না! কিন্তু এ বছর আবহাওয়াটা বড় বেতাল যাচ্ছে। জাহাজ চলাচল বা হাওয়াতে ব্যবসাপত্তর তো সব বন্ধই হয়ে গেছে, আর এখন দেখছি একেবারে খোদ ব্যবসার ঘাঁটি থেকেই ঝড়ের গর্জন শোনা যাচ্ছে।' অন্ধকারের দিকে হাত নাড়ল ম্যাকয়, যেন এই গহীন অন্ধকার চিরে কয়েকশ মাইল দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে ও। 'ঝড়টা পশ্চিমমুখো বইছে। কোথাও একটা সাজ্ঘাতিক কিছু ঘটছে, হ্যারিকেন বা ঐ রকমই কিছু একটা। তবু ভাল যে আমরা পূবদিকে এতটা চলে আসতে পেরেছি। তবে এটা একটা সাময়িক ব্যাপার। ঝড়টা খুব বেশিক্ষণ থাকবে না, দেখে নেবেন।'

সকাল নাগাদ ঝড়টা সত্যিই বেশ শান্ত হয়ে গেল। কিন্তু আগ্‌ বাড়াল এক নতুন বিপদ—কুয়াশা! চতুর্দিকে ঘন কুয়াশায়, ছেয়ে গেল কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। আর সেই কুয়াশার পর্দায় সূর্যের ঝিল্‌ঝিকমিক আলোর কণা, দরিয়ার বুকে এক আশ্চর্য রূপোলী ছটা, যেন চোখের সামনে কোন বর্ণময় চলচ্চিত্র দেখছে নাবিকরা।

গতকালের চেয়ে আজ আরও বেশি ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে পাইরেনীসের ডেকে। অফিসার আর নাবিকদের উৎফুল্লতাটুকু উধাও। রসুইঘর থেকে ভেসে আসছে কেবিন-বয়ের ফোঁপানির শব্দ। এই প্রথম সমুদ্রে এসেছে ছেলেটা, মৃত্যুভয়ে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট দিশেহারার মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন এদিক-ওদিক, গোঁফটা চিবোচ্ছেন মাঝে মাঝে, থেকে থেকে কুঁচকে উঠছে ভ্রু দুটো। কী-যে করবেন, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছেন না যেন।

শুকনো কলা আর এক মগ জল দিয়ে প্রাতরাশ সারছিল ম্যাকয়। পাশে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন, 'এখন উপায়?'

শেষ কলাটা মুখে পুরে, কিছুটা জল গলায় ঢেলে, চারদিকটা একবার দেখে নিল

ম্যাকয় । তারপর কথা বলল ও, চোখের গভীরে কোমল আভা, 'ক্যাপ্টেন, এখানে বসে থেকে পুড়ে মরার চেয়ে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। জাহাজের ডেকটা তো আর অনন্তকাল টিকে থাকবে না। আজ সকালে তো দেখছি ডেকটা আরও তেতে উঠেছে। আচ্ছা, আপনাদের জাহাজে কোন জুতো-টুতো নেই ? খালি পায়ে এই তাত যেন অসহ্য ঠেকছে।'

বন্দরের কাল হল শেষ। নোঙর তুলে আবার যাত্রা শুরু করল পাইরেনীস। উত্তুঙ্গ ঢেউ, জাহাজ টলোমলো। আহ্, পাটাতনের ঢাকনাটা খুলে ঐ জলরাশিকে যদি খোলের মধ্যে চালান করা যেত—ফার্স্ট মেটের সখেদ মন্তব্য। জাহাজের দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের দিকে চোখ রেখে গতিপথটা বুঝতে চেষ্টা করল ম্যাকয়।

'জাহাজের গতিটা আর একটু বাড়িয়ে দিলে ভাল হয়, ক্যাপ্টেন। বাতাসের অনুকূলেই তো চলেছি আমরা।'

এক পয়েণ্ট স্পিড তো আমি বাড়িয়ে দিয়েইছি'—জানালেন ক্যাপ্টেন।

'আমি ক্যাপ্টেন হলে কিন্তু দু পয়েণ্ট বাড়িয়ে দিতুম। ঝড়ের ধাক্কায় পশ্চিমমুখী স্রোতটা অনেকখানি সরে গেছে।'

শেষমেষ দেড় পয়েণ্ট গতি বাড়াতে রাজি হলেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট। তারপর ম্যাকয় আর ফার্স্ট মেটের সঙ্গে ডেকে গিয়ে উঠলেন। ডাঙা, ছোট্ট একটু স্বপ্নসবুজ ডাঙা, আর কতদূর ? ক্যাপ্টেনের চোখে আকুল জিজ্ঞাসা। জাহাজ এখন দশ নট্ গতিতে ছুটছে। সমুদ্র এখন শান্ত, সংযত। রুপোলী কুয়াশার আস্তরণ এখনও জমাট, নিশ্ছিদ্র। বেলা দশটা নাগাদ বেশ নার্ভাস হয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন। জাহাজের প্রত্যেকে, প্রতিটা মানুষ, একেবারে তৈরী, টানটান। ডাঙার সঙ্কেত পাওয়া মাত্রই চোয়াল চেপে উঠে দাঁড়াবে ওরা, বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে জাহাজটাকে। এই ঘন কুয়াশার মধ্যে হঠাৎ একেবারে সামনে কোন প্রবাল প্রাচীর বা কোন সিন্ধুফেনায়-ধোয়া ডাঙা, এসে পড়লে বিপদ ঘটে যেতে পারে।

আরও এক ঘণ্টা অতিক্রান্ত। ডেকে দাঁড়িয়ে তিনজন মানুষ খোঁজ-ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে আছে সেই রুপোলী বর্ণচ্ছটার দিকে।

আচমকা প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট, 'আমরা ম্যাঙ্গারেভায় পৌঁছতে না পারলে কী হবে ?'

সামনে থেকে চোখ না সরিয়ে ম্যাকয় জবাব দিল, 'চিন্তা করে লাভ নেই ক্যাপ্টেন। আমাদের এখন একমাত্র কাজ জাহাজটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া।

সারা পমোটাস্‌টাই আমাদের সামনে পড়ে আছে। এখানকার সব প্রবাল-প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও হাজার মাইল পাড়ি দিতে পারি। কোথাও-না-কোথাও গিয়ে ঠেকবই।'

'বেশ, চলুক জাহাজ,' নামার জন্য পা বাড়ালেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট, 'ম্যাঙ্গারেভায় আমরা পৌছতে পারি নি। পরের ডাঙা কতদূরে, ঈশ্বরই জানেন।' এক মুহূর্ত থেমে আবার বললেন, 'ওহ্, ঐ আধ পয়েন্ট গতি তখন বাড়িয়ে দিলেই হত। এই উদ্ভট স্রোতটা যেন আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।'

পিছিলের কাছাকাছি এসে ম্যাকয় বলল, 'পুরনো আমলের নাবিকরা এই পমোটাসকে বলত বিপজ্জনক অঞ্চল। আসলে এই স্রোতটার জন্যেই জায়গাটাকে বিপজ্জনক বলে থাকে লোকে।'

'বুঝলেন, একবার সিডনীতে এক নাবিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। এই পমোটাসেই তখন ব্যবসা-বাণিজ্য করছিল লোকটা। তা সে বলেছিল এখানে বীমার হার নাকি আঠার শতাংশ।'

'সত্যি ?' মিঃ কনিগ্‌ প্রশ্ন করলেন।

একটু হেসে মাথা নাড়ল ম্যাকয়, 'সত্যি। তবে ওরা কখনো বীমা করায় না, এই যা। স্কুনার মালিকরা প্রতিবছর স্কুনারের দামের কুড়ি শতাংশ লোকসান হিসেবে সরিয়ে রেখে দেয়।'

'সব্বোনাশ! তার মানে এক একটা স্কুনারের আয়ু মাত্র পাঁচ বছর,' ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্টের চোখে-মুখে বিস্ময়, মাথা নাড়ছেন ধীরে ধীরে, 'খুব খারাপ, খুব খারাপ।'

বড় ম্যাপ দেখার জন্য আবার কেবিনে ঢুকল ওরা, কিন্তু ঘরে থাকা গেল না। তীব্র পোড়া গন্ধ! ম্যাপটা নিয়ে কাশতে কাশতে বেরিয়ে আসতে হল তিনজনকে। ম্যাপটা এক জায়গায় আঙুল দেখিয়ে ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট বললেন, 'এই হচ্ছে, মোরেনহাউট দ্বীপ। এখান থেকে বড়জোর একশ মাইল হবে।'

'একশ দশ মাইল,' 'বলতে বলতে মাথা নাড়ল ম্যাকয়, 'যাওয়া যেতে পারে, তবে খুবই কঠিন। তীরে যাওয়া যেতেও পারে, আবার কোন প্রবালপ্রাচীর কিংবা ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজটা ডুবেও যেতে পারে। খারাপ জায়গা, খুবই খারাপ জায়গা।'

'তবু চেষ্টা করে দেখাই যাক'—বলে, জাহাজের গতিপথ স্থির করতে বসে গেলেন ক্যাপ্টেন।

বিকাল নাগাদ জাহাজের গতি কমিয়ে দেওয়া হল। কে জানে, রাতের অন্ধকারে দ্বীপটা যদি পেরিয়ে যায়! দ্বিতীয় প্রহর থেকেই নাবিকদের উৎফুল্ল ভাবটা ফিরে আসতে লাগল খুব কাছেই কোথাও ডাঙা আছে, কোন নিশ্চিন্ত আশ্রয়, সকাল হলেই শেষ হবে এই একটানা যন্ত্রণার, এই রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার।

অবশেষে নিশি হলো ভোর। সূর্যের, আলোয় রাঙিয়ে উঠল সিন্ধুপারের আকাশ আর সাগরের বুক-টলোমলো জলরাশি। দক্ষিণ-পূর্বমুখী বাতাস এখন ঘুরে গেছে পূর্বদিকে, আর পাইবেনীসও সেই দিকেই ছুটে চলেছে আট নট গতিতে। বিস্তর হিসেব-নিকেশ করে ক্যাপ্টেন জানালেন—মোরেনহাউট দ্বীপ আর বড়জোর দশ মাইল দূরে! দশ মাইল পেরিয়ে গেল, তারপর আরও দশ মাইল পেরিয়ে গেল, তবুও সামনে শুধু ঐ দিগন্ত-ছোঁয়া রোদ-থৈথৈ সমুদ্র ছাড়া তিনটে মাস্তলের মাথায় বসে থাকা তিনজন নজরদারের আর কিছুই চোখে পড়ল না।

পিছিল থেকে চিৎকার করে উঠলেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট, 'কিন্তু আমি হলপ করে বলছি, দ্বীপটা কাছেই কোথাও আছে।'

ম্যাকয়ের মুখে মোলায়েম হাসি। ওর দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, চোখে তাঁর উন্মাদের দৃষ্টি। সেক্সট্যাণ্টটা টেনে নিয়ে ক্রোনোমিটারে হিসেব করতে বসলেন তিনি। খানিক পরেই শোনা গেল ক্যাপ্টেনের চিৎকার, 'ঠিকই আছে! দক্ষিণদিকে একুশ, পঞ্চান্ন; পশ্চিমে একশ ছত্রিশ, দুই। এই তো হচ্ছে হিসেব। আর আট মাইল আমাদের উজান ঠেলে এগোতে হবে। আপনার হিসেব কী বলছে, মিস্টার কনিগ্?'

নিজের হিসেবের দিকে একবার তাকিয়ে, নিচুগলায় ফার্স্ট মেট কনিগ্ জানাল, 'একুশ, পঞ্চান্নটা ঠিকই আছে। কিন্তু আমার হিসেবে দ্রাঘিমারেখা দাঁড়াচ্ছে একশ ছত্রিশ, আটচল্লিশ। সেক্ষেত্রে বলতে হয়, আমরা বাতাসের দিকে অনেকটাই ঘুরে গেছি।'

ফার্স্টমেটের কথার কোন জবাব দিলেন না ক্যাপ্টেন, অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করলেন তাকে। দাঁতে দাঁত ঘষে কুৎসিত একটা গালাগাল উচ্চারণ করল ফার্স্ট মেট।

হুইলে বসা লোকটিকে নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন, 'চালিয়ে যাও। তিন পয়েন্ট গতি বাড়াও—হ্যাঁ, চলো।'

আবার হিসেব করতে বসলেন ক্যাপ্টেন। সারা মুখ থেকে ঘাম ঝরছে। গোঁফ, ঠোঁট, পেনসিল—কিছুই চিবোতে বাকি রাখছেন না। সামনে হঠাৎ ভূত দেখলে মানুষের চোখে যে দৃষ্টি দেখা যায়, সেই দৃষ্টি মেলে নিজের হিসেবগুলোর দিকে

তাকিয়ে আছেন ড্যাভেনপোর্ট। একসময় আচমকা লাফিয়ে উঠলেন তিনি, হিসেবের কাগজগুলো দলা পাকিয়ে পায়ের নিচে পিষে দিলেন। কনিগের মুখে ফুটে উঠল বিদ্রুপের রেখা। কেবিনের গায়ে ঠেস দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন, আধঘণ্টার মধ্যে একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না। চোখ সামনে, মুখে ফুটে-ওঠা হতাশা।

নীরবতা ভেঙে হঠাৎ কথা বললেন ড্যাভেনপোর্ট, 'মিস্টার ম্যাকয়, চার্টে দেখলুম এখান থেকে চল্লিশ মাইল উত্তর কিম্বা ও উত্তর-পশ্চিমে গোটাকতক দ্বীপ আছে, যেগুলোকে অ্যাক্টিয়ন দ্বীপপুঞ্জ বলে। ঠিক কটা দ্বীপ আছে, তা অবশ্য দেওয়া নেই। ওগুলোর সম্বন্ধে কিছু জানা আছে আপনার?'

'চারটে দ্বীপ আছে ওখানে, সবকটাই খুব নিচু,' জানাল ম্যাকয়। 'প্রথমটা পড়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, নাম হচ্ছে মাতুয়েরি। দ্বীপটায় কোন লোকজন থাকে না, লেগুনে ঢোকার কোন প্রবেশপথও নেই। তারপর পড়বে তেনারুঙ্গা। ওখানে একসময় দশ-বিশ জন লোক থাকত বটে, তবে তারাও বোধ হয় চলে গেছে; তাছাড়া জাহাজ ঢোকানোর রাস্তাও নেই, নৌকো হলে ঢুকতে পারে। জলের গভীরতা ফুট ছয়েকের বেশি নয়। বাকি দুটো দ্বীপ হচ্ছে ভেহ্গা আর তুয়া-রারো। দুটো দ্বীপই খুব নিচু, কোনটাতেই লোকজন নেই, প্রবেশপথও নেই। মানে ঐ অ্যাক্টিয়ন দ্বীপপুঞ্জে পাইরেনীসকে ভেড়ানোর কোন সুযোগ আমাদের নেই, ক্যাপ্টেন। চেষ্টা করতে গেলে গোটা জাহাজটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

ক্ষিপ্তের মত চিৎকার করে উঠলেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট, 'নিকুচি করেছে! লোকজন নেই, প্রবেশপথ নেই! বলি দ্বীপগুলো তাহলে আছেটা কী করতে!'

খানিক পরেই উত্তেজিত টেরিয়ারের মত হেঁকে উঠলেন ক্যাপ্টেন, 'ম্যাপে দেখছি এই উত্তর-পশ্চিম দিকে বেশ কয়েকটা দ্বীপ রয়েছে। এগুলোর হালটা কী? কোন একটাতেও কি জাহাজটা ঢোকানো যাবে না?'

চুপচাপ একটু ভেবে নিল ম্যাকয়। না, ম্যাপ দেখার কোন দরকারই নেই ওর। এইসব দ্বীপ, ডুবোপাহাড়, প্রবালপ্রাচীর, মগ্ন চড়া, লেগুন, প্রবেশপথ, দূরত্ব— সবকিছু নিখুঁতভাবে আঁকা হয়ে আছে ওর মনের মানচিত্রে। কোন শহুরে লোক যেমন তার শহরের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, গলিঘুঁজি নির্ভুলভাবে চেনে, ঠিক তেমনি দরিয়ার প্রতিটা ইঞ্চি হাতের তালুর মতো চেনে ম্যাকয়। ও বলল, 'পশ্চিমে কিংবা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে একুশ মাইলের থেকে কিছুটা বেশি দূরে রয়েছে পাপাকেনা আর ভানাভানা দ্বীপ। প্রথমটায় কোন জনবসতি নেই, আর আমি

শুনেছি দ্বিতীয়টার বাসিন্দারা নাকি সব ক্যাড্‌মাস দ্বীপপুঞ্জে চলে গেছে। তা সে যা-ই হোক, দুটো লেগুনেরই কোন প্রবেশপথ নেই। ওখান থেকে আরও একশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে আহুমুই দ্বীপ। ওটারও কোন প্রবেশপথ নেই, লোকজনও থাকে না।'

চার্ট থেকে মাথা তুলে ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট শুধোলেন, 'ওখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে আরও দুটো দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। ওগুলোর কী হাল?'

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে ম্যাকয় জানাল, 'পারোস আর মানুহুঙ্গীর কথা বলছেন। প্রবেশপথ নেই, লোকজন নেই। আরও চল্লিশ মাইল দূরে রয়েছে নেঙ্গো-নেঙ্গো। ওখানেও কোন লোকজন বা প্রবেশপথ নেই। তবে হাও দ্বীপটা ওর কাছেই পড়বে ওইটাই হচ্ছে উপযুক্ত জায়গা। লেগুনটা লম্বায় তিরিশ মাইল আর চওড়ায় মাইল পাঁচেক। প্রচুর লোকও বাস করে দ্বীপটায়। জল পেতে কোন অসুবিধেই হবে না। আর ওখানকার প্রবেশপথ দিয়ে পৃথিবীর যে-কোন জাহাজই অনায়াসে চলে যেতে পারে।'

কথা শেষ করে জিজ্ঞাসু চোখে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল ম্যাকয়। একজোড়া ডিভাইডার হাতে নিয়ে ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়ে কিছু-একটা হিসেব করছিলেন ড্যাভেনপোর্ট। শুধোলেন, 'ঐ হাও দ্বীপের থেকে কাছে আর আর কি এমন কোন লেগুন ওয়ালা দ্বীপ নেই, যেখানে জাহাজ ঢোকানোর প্রবেশপথ পাওয়া যাবে?'

'না ক্যাপ্টেন, তেমন কোন জায়গা নেই।'

খুব ধীরগলায়, ভেবেচিন্তে ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট বললেন, 'হুঁ, হাও দ্বীপটা এখান থেকে তিনশ চল্লিশ মাইল পথ। না, এতগুলো জীবনের ঝুঁকি আমি কিছুতেই নিতে পারি না। এই অ্যাক্টিয়ন অঞ্চলেই ঢুকতে হবে আমাদের, তাতে যদি জাহাজটা ধ্বংস হয়ে যায়, তো যাক।' জাহাজের গতিপথ পরিবর্তন করার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন, পশ্চিমমুখী স্রোতের কথা হিসেব করে দিক ঠিক করলেন, তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে যেন নিজেকেই শোনালেন, 'বড় ভাল ছিল জাহাজটা'। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সারা আকাশটা ছেয়ে দেখা দিল ঘন-কালো মেঘের দল! দক্ষিণ-পূর্বমুখী বাতাসটা বইছে বটে কিন্তু সাগরের বুকে যেন দাবার ছক সাজিয়ে বসে গেছে ঢেউ আর ঝড়, মুখোমুখী।

'একটা নাগাদ ওখানে পৌঁছে যাব মনে হচ্ছে', ক্যাপ্টেনের গলায় সুস্পষ্ট প্রত্যয়, 'আর দুটো নাগাদ একেবারে সামনে পৌঁছে যাব। আপনি শুধু একটা কাজ করবেন, মিস্টার ম্যাকয়। ওগুলোর মধ্যে যে দ্বীপটায় লোকজন আছে, সেইটাতে

ভিড়িয়ে দেবেন জাহাজটাকে।'

মেঘ ছিঁড়ে সূর্য আর দেখা দিল না। আর, বেলা একটার সময়, কোথাও কোন ডাঙার চিহ্নও চোখে পড়ল না। বিস্মিত চোখে জাহাজের পিছনের স্রোতের দিকে নিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চিৎকার করে উঠলেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট, 'কি আশ্চর্য! এ যে পূর্বমুখী স্রোত!'

কনিগের চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছায়া। ম্যাকয় নির্বাক (ও অবশ্য আগেই বলেছিল এই পমোটাস অঞ্চলে পূর্বমুখী স্রোত না থাকার কোন কারণ নেই)। মিনিট কয়েক পরেই ধেয়ে এল এক প্রবল দমকা হাওয়া, ফুঁসে উঠল সাগর, ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলতে লাগল পাইরেনীস।

ড্যাভেনপোর্ট চিৎকার করে উঠলেন, 'আরে, ওদিকটা দেখুন, ওদিকটা।' বলতে বলতে লিড-লাইনটা চেপে ধরলেন ক্যাপ্টেন। লাইনটা তখন উত্তর-পূর্ব দিকে ঘুরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আবার চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'হাত লাগাও, হাত লাগাও।'

ম্যাকয় আর মেট চেষ্টা করল লাইনটা চেপে ধরে রাখার। আথাল-পাথাল ঢেউয়ের দোলায় থরথর করে কাঁপছে তখন লাইনটা।

কনিগ্ বলল, 'চার নট স্রোত।'

'পশ্চিমা স্রোতের বদলে পূর্বমুখী স্রোত'—বলতে বলতে এমনভাবে ম্যাকয়ের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, যেন দোষটা আদতে তারই।

'এখানে যে বীমার হার আঠার শতাংশ, এটা তার একটা বড় কারণ ক্যাপ্টেন', ম্যাকয় বেশ উৎফুল্ল, 'এখানে আগে থেকে কিছুই বলা যায় না। স্রোত হরবখৎ দিক পাল্টাচ্ছে। ক্যাস্কো বলে একটা ইয়টে একজন লেখক ছিলেন, নামটা ভুলে গেছি, বইটই লিখতেন তিনি। তাঁর কী ঘটেছিল জানেন? যাচ্ছিলেন তাকারোয়ায় তা এই দিক-পাল্টানো স্রোতের ধাক্কায় সেখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে বেঁকে পৌঁছোন গিয়ে সেই তিকেই-এ! যাক সে-কথা। এখন আমাদের উজান ঠেলে এগোতে হচ্ছে, গতিটা বরং কয়েক পয়েন্ট বাড়িয়ে দিন।'

ক্যাপ্টেন অসহিষ্ণু, 'কিন্তু এই স্রোতের ধাক্কায় আমরা কতটা সরে এসেছি, সেটা বুঝব কী করে?'

শান্ত কণ্ঠে ম্যাকয় জানাল, 'তা তো আমি বলতে পারব না, ক্যাপ্টেন।'

আবার দমকা হাওয়া। পাইরেনীসের ডেকে ধোঁয়ার ঘুরপাক, নিচে আগুনের তিরতিরে কাঁপন। হাওয়ার ধাক্কায় অন্ধের মত ছুটে চলেছে জাহাজটা। একবার

হেলছে ডানদিকে, আবার বাঁদিকে। জল তোলপাড় করে পাইরেনীস খুঁজে বেড়াচ্ছে অ্যাক্টিয়ন দ্বীপমালাকে, কিন্তু মাস্তুলশীর্ষে বসে থাকা নজরদারদের চোখে ধরা দিচ্ছে না সেই অগাধ স্বপ্নের ডাঙা।

ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট দিগ্‌ভ্রান্ত। তাঁর তীব্র ক্রোধ রূপান্তরিত হয়েছে চরম নীরবতায়। সারাটা বিকাল তিনি শুধু উদ্‌ভ্রান্তের মত পায়চারি করলেন পিছিলে, কখনও বা কোথাও ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন পাথরের মূর্তির মত। ধীরে ধীরে নেমে এল রাত। ম্যাকয়ের সঙ্গে কোনরকম আলোচনা না করেই উত্তর-পশ্চিম দিকে জাহাজ চালানোর নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। উদ্বিগ্ন কনিগ ক্যাপ্টেনকে না জানিয়ে ম্যাপ আর কম্পাস দেখে বুঝতে চেষ্টা করল হচ্ছেটা কী! আর ম্যাকয়? ক্যাপ্টেনের সামনেই ও চোখ রাখল কম্পাসে। জাহাজ কোন্‌দিকে চলেছে বুঝতে অসুবিধে হল না ওর—পাইরেনীস ছুটে চলেছে হাও দ্বীপের ঠিকানায়। মাঝরাত নাগাদ কমে এল ঝোড়ো হাওয়ার দাপট, আকাশের আঁধারী পর্দায় ফুটে উঠল হীরেদানার মত একমুঠো তারা। কিছুক্ষণ পরেই একটা ঝকঝকে দিন হাতে পাওয়ার আশায় ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্টের উদ্বিগ্ন মুখে ফুটে উঠল এক উজ্জ্বল আভা।

ম্যাকয়ের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'সকালে ভাল করে দেখতে হবে। অক্ষাংশের ব্যাপারটা অবশ্য ধোঁয়াটেই হয়ে আছে। তবে ও নিয়ে ভাবনার কিছু নেই, সুম্‌নার পদ্ধতি ব্যবহার করে ওটা ঠিক বার করে ফেলব! আপনি কি সুম্‌নার লাইনের ব্যাপারটা জানেন?'

অতঃপর সুম্‌নার লাইন কাকে বলে, কী বৃত্তান্ত—সব কিছু বিস্তারিতভাবে ম্যাকয়কে বোঝালেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট।

সকাল। ঝকঝকে, আলো-মাখা সকাল। পূবদিক থেকে হাওয়া বইছে। পাইরেনীস জল কাটছে ন' নট গতিতে। সুম্‌নার পদ্ধতি অনুযায়ী জাহাজের অবস্থানটা খুঁজে বার করলেন ক্যাপ্টেন আর মেট। দুপুরে আবার বসলেন. সকালের অবস্থার সঙ্গে দুপুরের অবস্থানটা মিলিয়ে দেখলেন।

'আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওখানে পৌঁছে যাব আমরা', ম্যাকয়কে জানালেন ক্যাপ্টেন, 'জাহাজের ডেকটা যে কী করে এখনও টিকে আছে, কে জানে! কিন্তু খুব বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না, কিছুতেই না। প্রত্যেক দিন আরও বেশি বেশি ধোঁয়া বেরোচ্ছে, দেখছেন তো! ডেকটা তৈরী করা হয়েছিল খুব মজবুত করে। আগুন লাগতে দেখে আমরা তো একেবারে থ হয়ে গিয়েছিলুম। তক্তা-টক্তা চাপিয়ে সামাল দেওয়ারও চেষ্টা করেছিলুম। আরে আরে, কি কাণ্ড!'

ক্যাপ্টেনের আতঙ্কভরা চোখ জাহাজের পিছনের মাস্তুলের দিকে। কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়ার একটা রেখা ডেক থেকে প্রায় বিশ ফুট উঁচুতে ঐ মাস্তুলের মাথাটাকে পেঁচিয়ে ধরেছে। চোয়ালটা ঝুলে পড়ল ক্যাপ্টেনের।

'অত উঁচুতে ধোঁয়া? আশ্চর্য, ঐখানে গেলোটা কী করে?' ক্যাপ্টেনের গলায় অসহিষ্ণুতা।

মাস্তুলের নিচের দিকটায় কিন্তু কোন ধোঁয়া নেই। আসলে ডেক থেকে উঠে মাস্তুলের আড়াল পেয়েছে কুণ্ডলীটা। ফলে বেঁচে গেছে হাওয়ার ঝাপট থেকে। তারপর কোন বিচিত্র উপায়ে ওপরে উঠে গিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে মাস্তুলের ডগাটা। এইসময়ই হটাৎ কুণ্ডলীটা পাক খেয়ে নেমে এল নিচের দিকে, ঝুলে রইল ক্যাপ্টেনের মাথার ওপর, যেন কোন এক অশুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী। পরমুহূর্তেই বাতাসের দোলায় মিলিয়ে গেল কুণ্ডলীটা। ক্যাপ্টেনের চোয়ালটা স্বাভাবিক হল এতক্ষণে।

'হ্যাঁ, যা বলছিলুম। আরে মশাই, প্রথমটায় তো আমি একেবারে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলুম। এমন মজবুত একটা ডেক, অথচ তা থেকে একেবারে গল্‌গল করে ধোঁয়া উঠছে! তারপর থেকে নাগাড়ে কাঠের টুকরো বসিয়ে বসিয়ে তাপ্পি দিয়ে যাচ্ছি। তবুও রাশ রাশ ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে, দেখছেন তো! নিচে কি সাঙ্ঘাতিক চাপ পড়ছে ভেবে দেখুন!'

সেদিন বিকাল নাগাদ আকাশ জুড়ে আবার ডানা ছড়াল কালো মেঘের দল, শুরু হল ঝোড়ো হাওয়া, রিম্‌ঝিম বৃষ্টি। ঘন ঘন দিক পাণ্টাচ্ছে বাতাস। একবার বইছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, আবার ঘুরে যাচ্ছে উত্তর-পূর্ব মুখে। মাঝরাত নাগাদ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ধেয়ে আসা (মাঝে মাঝে ঐ-দিক থেকেও ছুটে আসছিল হাওয়া) একটা দমকা হাওয়ার প্রচণ্ড ধাক্কায় পিছু হঠলো পাইরেনীস।

সকাল সাতটা। পূব আকাশে জমে থাকা ঘন মেঘের আড়ালে সূর্য ফেরার। ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্টের মন্তব্য, 'দশটা-এগারটার আগে হাও দ্বীপপুঞ্জে পৌছনোর কোন আশা নেই।' তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'স্রোতগুলো কি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল নাকি!'

নজরদাররা জানাল—কোথাও কোন ডাঙা চোখে পড়ছে না। সারাটা দিন ধরে চলল টিপটিপে বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। রাত নামল। আর তার সঙ্গেই পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে আসতে লাগল উন্মত্ত ঢেউয়ের দল। ব্যারোমিটারের কাঁটা নেমে এসেছে ২৯.৫০-এ। হাওয়া আর নেই, তবু সমুদ্র ফুঁসছে,

ফুঁসেই চলেছে পশ্চিমের গভীর আঁধার থেকে ধেয়ে আসা অবিরাম থ্যাপ। ঢেউয়ের তাথৈ দোলায় মোচার খোলার মত পাকসাট খাচ্ছে পাইরেনীস। নজরদার দুজন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালটা গুটিয়ে ছোট করেছে। ক্লান্ত কর্মীরা কাজ শেষ করার পর আঁধার চিরে ভেসে আসেছে তাদের চেরা কণ্ঠস্বর, যেন কোন পশুর ভয়াবহ গর্জন। ডানদিকের নজরদারদের বলা হল পিছিলে এসে দড়ি দিয়ে নিজেদেরকে ভাল করে মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে নিতে। বলা তো যায় না, বিপদ হতে কতক্ষণ! লোকগুলো এল বটে, কিন্তু ওদের চোখে-মুখে স্পষ্ট অনিচ্ছার ছাপ। প্রতিটি পদক্ষেপেই ঝরে পড়ছে প্রতিবাদ আর হুমকি। ভিজে-ভিজে, আঠার মত থক-থকে আবহাওয়া। হাওয়া উধাও। একটু বাতাসের জন্য যেন ছটফট করছে প্রত্যেকে। মানুষগুলোর সারা মুখ আর আঢাকা হাত বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঘাম! ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্টের মুখ আরও কঠিন, আরও দুশ্চিন্তাছাওয়া। নিষ্পলক চোখে উদ্বেগের ছায়া। ঘনিয়ে আসা সর্বনাশের ভাবনায় ক্যাপ্টেন দিশাহারা।

উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করল ম্যাকয়, 'ঢেউগুলো পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন। আর খুব বেশি ধাক্কা-টাক্কা লাগবে না।'

বৃথা চেষ্টা। ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্টের মুখে সান্ত্বনার আঁচড়টুকুও পড়ল না। লণ্ঠনের আলোর সামনে একটা বই নিয়ে বসলেন, খুললেন একটা বিশেষ পরিচ্ছেদ। সাইক্লোনের মুখে পড়লে জাহাজের ক্যাপ্টেনদের কর্তব্য কী—সেটাই ঐ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু। আর ঠিক তখনই, নৈঃশব্দ ভেঙে ভেসে এল কেবিন-বয়ের গোঙানি।

'অ্যাই—চোপ'—চিৎকার করে উঠলেন ক্যাপ্টেন। চমকে উঠল প্রত্যেকে, আর বেচারা ছেলেটা যেন শিউরে উঠল ভয়ে।

'মিস্টার কনিগ্‌', ক্রোধ আর উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর, 'ছোঁড়াটার গলার মধ্যে একটা ঝাড়ু-টাড়ু কিছু গুঁজে দিতে পারেন!'

কনিগ্‌ নন, এগিয়ে গেল ম্যাকয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ছেলেটা।

ভোরের ঠিক আগে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে হাওয়া বইতে শুরু করল। আস্তে আস্তে কিছুটা বেগ বাড়ল বাতাসের। সমস্ত জাহাজীরা ডেকে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার কী ঘটবে?

ক্যাপ্টেনের পাশেই দাঁড়িয়েছিল ম্যাকয়। বলল, 'আর ভয় নেই ক্যাপ্টেন।

ঝড়টা পশ্চিমদিকে সরে গেছে। আমরা আছি ঝড়টার দক্ষিণ দিকে। এই হাওয়া এর থেকে জোরে আর বইবে না। এবার পালটা খাটিয়ে দিতে পারেন।'

'কিন্তু লাভটা কী? জাহাজটা চালাব কোন্‌দিকে? আজ নিয়ে দুদিন আমরা কোন দিক ঠিক করতে পারছি না। হিসেব মতো গতকাল সকালেই হাও দ্বীপটা চোখে পড়া উচিত ছিল। এখন বলুন সে দ্বীপটা কোন্‌দিকে পড়বে—উত্তরে, দক্ষিণে, পুবে না কোন্ চুলোয়? আপনি শুধু দিকটা বলে দিন, আমি এক্ষুনি ছুটব সেইদিকে।'

মৃদু গলায় ম্যাকয় বলল, 'আমি তো নাবিক নই ক্যাপ্টেন।'

'এই পমোটাসে আসার আগে পর্যন্ত নিজেকে আমি একজন নাবিকই মনে করতুম'—বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

দুপুর নাগাদ শোনা গেল একজন নজরদারের চিৎকার, সামনে ব্রকার, হুঁশিয়ার। ঝটপট দিক পাল্টাল পাইরেনীস, নামিয়ে ফেলা হল পালগুলো। জলস্রোতে যেন পিছলে যাচ্ছে জাহাজটা, প্রাণপণে যুঝছে স্রোতের বিরুদ্ধে। এই স্রোতের সঙ্গে পাল্লা লড়তে না পারলে জাহাজটা ছিটকে গিয়ে পড়বে একেবারে ঐ পাহাড়টার ওপর। অফিসাররা আর নাবিকরা পাগলের মত খাটছে। রাঁধুনী, কেবিন বয়, ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট স্বয়ং আর ম্যাকয়ও হাত লাগিয়েছে। এক চুলে জন্যে বেঁচে গেল জাহাজটা। এ জায়গাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক, সারাক্ষণই বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ে পাহাড়টার গায়ে। কোন মানুষ এখানে বাস করতে পারে না, এমনকি সামুদ্রিক পাখিরা পর্যন্ত একটু জিরিয়ে নিতে পারে না পাহাড়টায় বসে। পাহাড়টার একশ গজের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল পাইরেনীস। সেখান থেকে অবশেষে সরে আসতে পেরেছে জাহাজটা। আর তারপরই ক্লান্ত নাবিকরা ম্যাকয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে, সমস্বরে অভিসম্পাত দিতে শুরু করেছে তাকে। এই লোকটাই, এই লোকটাই জাহাজে উঠে তাদেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ম্যাঙ্গারেভার দিকে ছুটিয়েছে, পিটকেয়ার্ন দ্বীপের নিরাপদ আশ্রয় সরিয়ে এনেছে এই উত্তাল কূলহীন দরিয়ার বুকে। সব শুনল ম্যাকয়, কিন্তু বিচলিত হল না এতটুকুও, হাসল সরল উদার হাসি। ওর ঐ সরলতাটুকু যেন ছুঁয়ে গেল নাবিকদের অন্তর। লজ্জা পেল ওরা। গলার কাছে উগরে আসা অভিসম্পাতগুলো অনুচ্চারিতই রয়ে গেল।

'সবই বরাত'—আপনমনে বিড়বিড় করে চলেছেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট। জাহাজ এগোচ্ছে। হঠাৎই উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকালেন

সেই পাহাড়টার দিকে। ঐ পাহাড় আজ মৃত্যুর দূত হয়ে উঠতে পারত। এখন বিপদ কেটে গেছে, উজান ঠেলে এগিয়ে চলেছে পাইরেনীস।

আবার বসে পড়লেন ক্যাপ্টেন, মুখ ঢাকলেন দু'হাতে। তিনি যা দেখেছেন, আর সকলেও তা দেখল—ফার্স্ট মেট দেখলেন, ম্যাকয় দেখল, দেখল প্রতিটি নাবিক। ঐ পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে বয়ে চলেছে এক পূর্বমুখী স্রোত। ঐ স্রোতই জাহাজটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আর পাহাড়টার উত্তর দিকে বইছে পশ্চিমমুখী এক তীব্র স্রোত, যার টানেই সরে আসতে পেরেছে পাইরেনীস, এগিয়ে চলেছে জল কেটে।

মুখ তুললেন ক্যাপ্টেন। বিবর্ণ, ফ্যাকাশে মুখ। ভাঙা গলায় বলে উঠলেন, 'এই পমোটাসের কথা আমি আগেও শুনেছি। এইখানেই ক্যাপ্টেন ময়েনদালের জাহাজডুবি হয়েছিল। পরে তিনিই আমাকে এখানকার কথা বলেছিলেন। শুনে তাঁকে উপহাস করেছিলুম। হা ঈশ্বর, উপহাস করেছিলুম তাঁকে। ওটা কোন্ পাহাড়?' ম্যাকয়ের কাছে জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

'আমি জানি না, ক্যাপ্টেন।'

'কেন জানেন না?'

'কারণ আগে কখনও পাহাড়টা দেখিওনি, কারুর মুখে শুনিওনি। কোন ম্যাপেও এটার উল্লেখ নেই। আসলে এদিকটায় কখনও ঠিকমত অনুসন্ধানও চালানো হয় নি।'

'তাহলে আমরা এখন ঠিক কোথায় আছি, তা আপনার জানা নেই?'

'না ক্যাপ্টেন।'

বিকাল চারটে নাগাদ দূরে কিছু নারকেল গাছ দেখা গেল, যেন অগাধ জলের গভীর থেকেই মাথা তুলেছে আকাশে। খানিক পরে সাগরের বুকে একটা নিচু প্রবালদ্বীপ চোখে পড়ল।

চোখ থেকে দূরবীনটা নামিয়ে ম্যাকয় বলল, 'ক্যাপ্টেন, এবার বলতে পারি আমরা কোথায় আছি। ওটা হচ্ছে রেজোলিউশন দ্বীপ। হাও দ্বীপ ছাড়িয়ে চল্লিশ মাইল এগিয়ে এসেছি আমরা। বাতাস আমাদেব উল্টোদিকে ঠেলছে।'

'তাহলে ওখানেই জাহাজ ভেড়ানো যাক। প্রবেশপথটা কোন্‌দিকে?'

'প্রবেশপথ? ওখান দিয়ে শালতি ছাড়া আর কিছু ঢুকতে পারবে না। তবে কোথায় আছি যখন জানা গেছে, তখন আমরা অনায়াসেই বার্কলে-দ্য-টলির দিকে যেতে পারি। ও দ্বীপটা এখান থেকে উত্তর-উত্তরপশ্চিমে মাত্র একশ কুড়ি

মাইল দূরে। এ-রকম বাতাস থাকলে আগামীকাল সকাল নটা নাগাদই পৌঁছে যাওয়া যাবে।'

ম্যাপ খুললেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট। তাঁর মনের মধ্যে অজস্র তোলপাড়।

ম্যাকয় বলল, 'জাহাজটাকে যদি আমরা এখানে ধ্বংস করে ফেলি, তাহলে কিন্তু আমাদের বোটে করেই বার্কলে-স্ত-টলিতে যেতে হবে ক্যাপ্টেন।'

এগিয়ে চলার আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। মৃত্যুর ইশারাবাহী দরিয়ার স্রোত ঠেলে আবার ছুটে চলল পাইরেনীস।

পরের দিন। দিন তখন মাঝ-প্রহর পেরিয়ে বিকাল। পাইরেনীসের ধোঁয়া-ওড়া ডেকে ছড়িয়ে রয়েছে হতাশা আর ক্ষোভ। স্রোতের বেগ বেড়ে গেছে অনেক, বাতাসের গতি শ্লথ। পশ্চিমদিকে সরে গেছে পাইরেনীস। মাস্তুলের চুড়োয় বসে নজরদার দেখেছে দূরে, অনেক দূরে, আবছাভাবে ফুটে ওঠা বার্কলে স্ত-টলি। কয়েক ঘণ্টা ধরে নাবিকরা চেষ্টা করেছে দ্বীপটার দিকে এগোনোর। পারেনি। মরীচিকার মত দিগন্তে মিলিয়ে গেছে নারকেল গাছের সারি। মাস্তুলশীর্ষের নজরদাররা দেখতে পেয়েছে গাছগুলোকে, কিন্তু ডেকে দাঁড়ানো অস্থির মানুষগুলোর চোখের সীমানা ছাড়িয়ে হারিয়ে গেছে স্বপ্নের ডাঙা।

আবার ম্যাপ খুলে বসলেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট, পরামর্শ করলেন ম্যাকয়ের সঙ্গে। দক্ষিণ-পশ্চিমে পঁচাত্তর মাইল দূরে রয়েছে ম্যাকেমো দ্বীপ। দ্বীপটায় তিরিশ মাইল দীর্ঘ লেগুন আছে, প্রবেশপথটাও চমৎকার। এগিয়ে চলার আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু বেঁকে বসল নাবিকরা। বলল—সারাক্ষণ এক অগ্নিকুণ্ডের ওপর দিন কাটাচ্ছে তারা। সামনেই রয়েছে ডাঙা। জাহাজ ওখানে ঢুকতে না পারলেই বা কী যায় আসে? বোটে করেই ডাঙায় গিয়ে উঠবে তারা। জাহাজটা পুড়ে পুড়ে ধ্বংস হয় তো হোক। জাহাজের থেকে তাদের জীবনের দাম অনেক বেশি। এতদিন তারা জাহাজের স্বার্থ দেখেছে, এবার নিজেদের স্বার্থই দেখতে চায়।

ছিটকে উঠল নাবিকরা, ছুটে গেল বোটগুলোর দিকে, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সেকেণ্ড আর থার্ড মেটকে। বোটে ওঠার জন্য নাবিকরা এখন মরিয়া। ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট আর ফার্স্ট মেট এক ঝটকায় রিভলবার বার করলেন, দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন পিছিলের দিকে। আর ঠিক তখনই ভেসে এল ম্যাকয়ের কণ্ঠস্বর। কেবিনের মাথায় উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ও।

নাবিকদের উদ্দেশে অনেক কথা বলে গেল ম্যাকয়। সেই কোমল, পাখির ডাকের

স্নত কণ্ঠস্বর শোনা মাত্র দাঁড়িয়ে পড়ল নাবিকরা। ম্যাকয়ের অটুট অচঞ্চলতা, আশ্চর্য প্রশান্তিভরা মন যেন ছুঁয়ে গেল ওদের। ঐ কোমল কণ্ঠস্বর আর সহজ-সরল কথাগুলোয় বুঝি কোন মায়াবী জাদুর স্পর্শ লুকিয়ে রয়েছে। হাজার বিক্ষোভ বুকে নিয়েও শান্ত হয়ে উঠলো নাবিকরা। বিস্মৃতির অথৈ আঁধার থেকে যেন জেগে উঠছে হারানো কিছু ছবি, মনে পড়ে যাচ্ছে সেই কোন্ ছেলেবেলায় দিনান্তের মোহনায় মায়ের কোলে শুয়ে শোনা ঘুমপাড়ানী গানের কথা! দুনিয়ার কোথাও যেন কোন সমস্যা নেই, বিপদ নেই, ক্লান্তি নেই। যেন সবকিছুই ঠিকঠাক আছে, এখন শুধু ঐ ডাঙাকে পিছনে ফেলে আবার দরিয়ার বুকে ভেসে পড়ার অপেক্ষা। পায়ের নিচে আগুন? থাকুক না, কী আসে-যায়!

সহজ সরল ভাষায় কথা বলছিল ম্যাকয়। কিন্তু কথাকে ছাপিয়ে উঠছিল ওর ব্যক্তিত্ব, যে-কোন শব্দের থেকে অনেক বেশি ব্যঞ্জনাময়, অনেক বেশি অর্থবহ এক প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব। আশ্চর্য নম্র, সুগভীর এক আত্মা যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে তার কোমল, আকর্ষক আর প্রচণ্ড কর্তৃত্বময় পরশ। নাবিকদের মনের গহনে এখন শান্ত মোহময় এক বাতির আলো। অফিসারদের ঝকঝকে, মরণডাকা আগ্নেয়াস্ত্রের থেকে যা অনেক শক্তিশালী। এক শুদ্ধ শান্ত স্বর্গীয় আনন্দের স্পর্শ।

নাবিকরা যে যার জায়গায় স্থির, বুকের গভীরে দোলাচল। যারা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, তারা পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারপর, এক এক করে সকলেই ফিরল, পিছিয়ে এল।

কেবিনের মাথা থেকে নেমে এল ম্যাকয়। শিশুসুলভ আনন্দে উদ্ভাসিত ওর চোখ-মুখ; সমস্যা মিটে গেছে। সত্যি বলতে কি, যে শান্তিময় পৃথিবীতে ওর নিয়ত বাস, সেখানে কখনোই তো কোন সমস্যা থাকে না!

'আপনি ওদের সম্মোহিত করেছিলেন'—মিস্টার কনিগের চাপা গলায় ব্যঙ্গের আভাস।

ম্যাকয় উত্তর দিল, 'এই ছেলেগুলো খুব ভাল। ওদের মনে কোন পাপ নেই। কঠিন অবস্থার মধ্যে রয়েছে ওরা, প্রাণপাত করে খাটতে হচ্ছে। সারা জীবন এইভাবেই খেটে যাবে ওরা।'

প্রত্যুত্তর দেওয়ার সময় কোথায় কনিগের! একটার পর একটা নির্দেশ দিয়ে চলেছেন তিনি। বিনা প্রতিবাদে কাজে হাত লাগাচ্ছে নাবিকরা। আস্তে আস্তে ঘুরে যাচ্ছে পাইরেনীস। আবার সেই ভেসে চলার পালা। লক্ষ্য এবার ম্যাকেনো।

হাওয়া খুব কম। সন্ধ্যের পর প্রায় বন্ধই হয়ে গেল। অসহ্য গরম। আগিল বা পিছিলে চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারল না কেউ। ডেকের ওপরটা তেতে আগুন। পাটাতনগুলোর জোড়ের ফাঁক দিয়ে উঠে আসছে বিষাক্ত বাষ্প, অশুভ আত্মার মত ছড়িয়ে পড়ছে সারা জাহাজে। নাবিকদের নাকে-মুখে ঢুকে পড়ছে বাষ্প, শোনা যাচ্ছে হাঁচি আর কাশির শব্দ। মাথার ওপরে একরাশ তারার অলস ঝিকিমিকি। পূব দিকে চোখ মেলেছে পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ। ডেকে, রেলিঙে আর মাস্তুলে ছড়িয়ে থাকা কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার রাশকে ছুঁয়ে যাচ্ছে চাঁদের রুপো-গলা স্নিগ্ধ আলো।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে কথা বলছিলেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট, 'আচ্ছা, সেই বাউন্টি জাহাজের লোকেরা পিটকেয়ার্নে পৌঁছনোর পর কী ঘটেছিল? আমি যে-সব বিবরণ পড়েছি, তাতে বলা হয়েছে ওরা নাকি বাউন্টি জাহাজটাকে পুড়িয়ে দিয়েছিল, আর বহু বছর পর ওদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ঐ মাঝের সময়টায় কী কী ঘটেছিল জানেন? বরাবরই আমার এই ব্যাপারটা জানার খুব কৌতূহল রয়েছে। জাহাজের যাত্রীরা তো সব ফাঁসীর আসামী ছিল জনাকয়েক আদিবাসীও ছিল বলে শুনেছি। তাছাড়া বেশ কয়েকজন মেয়েছেলেকেও তারা জুটিয়ে নিয়েছিল। আর মেয়েছেলে যখন ছিল, তখন ঝামেলা ঝক্কি কি আর বাধেনি।'

ম্যাকয় উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, ঝামেলা তো বেধে ছিলই। লোকগুলো তো ভাল কেউ ছিল না। প্রথম থেকেই মেয়েদের নিয়ে ঝগড়া বেধেছিল ওদের মধ্যে। বিদ্রোহীদের মধ্যে উইলিয়ামস বলে একজনের বৌ মারা যায়। সবকটা মেয়েই ছিল তাহিতি দ্বীপের। তা হয়েছিল কি, পাহাড়ের ওপরে উঠে সামুদ্রিক পাখি ধরতে গিয়ে উইলিয়ামের বৌটা গড়িয়ে পড়ে মারা যায়। উইলিয়ামস তখন একজন আদি-বাসীর কাছ থেকে তার বৌকে জোর করে কেড়ে নেয়। এই ঘটনায় আদিবাসীরা ভীষণ খেপে ওঠে। বেশ কিছু শ্বেতাঙ্গ বিদ্রোহীকে মেরে ফেলে ওরা। যে কজন বিদ্রোহী পালাতে পেরেছিল, তারা আবার একসময় ঐ আদিবাসীদের সুযোগ পেয়ে খুন করে। ঐ সব মেয়েরা আবার এ ব্যাপারে ওদের সাহায্য করেছিল। তারপর আদিবাসীরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে একে অপরকে খুন করতে শুরু করে। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে খুন করতে উঠে-পড়ে লেগেছিল। সাঙ্ঘাতিক লোক ছিল ওরা।

'তিমিতি বলে একজন আদিবাসীকে অন্য দুজন আদিবাসী বন্ধুর মত চুল আঁচড়ে দিতে দিতে খুন করে। ঐ দুজনকে শ্বেতাঙ্গরাই পাঠিয়েছিল। পরে ঐ শ্বেতাঙ্গরাই

আবার ওদের দুজনকে মেরে ফেলে। তুলালু খুন হয় একটা গুহার মধ্যে। ওর বৌ-ই ওকে খুন করেছিল। আসলে ওর বৌ চাইছিল একজন শ্বেতাঙ্গকে বিয়ে করতে। সবকটাই ছিল একেবারে পাক্কা বদমাশ। ঈশ্বর ওদের ত্যাগ করে-ছিলেন। দু'বছর পর দেখা গেল একজনও আদিবাসী বেঁচে নেই, আর শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বেঁচে আছে মাত্র চারজন—ইয়ং, জন অ্যাডাম্‌স্‌, ম্যাকয়, হ্যাঁ এই ম্যাকয়ই ছিলেন আমার ঠাকুর্দার বাবা, আর কুইন্টাল। এই কুইন্টালও মোটেই ভাল লোক ছিল না। একবার তার বৌ খাবার জন্যে যথেষ্ট মাছ ধরে আনতে পারেনি বলে লোকটা দাঁত দিয়ে বৌয়ের একটা কান ছিঁড়ে নিয়েছিল।'

'বদমাশের দল', মন্তব্য কনিগের।

'হ্যাঁ, খুবই বদমাশ ছিল ওরা', ম্যাকয় একমত। শান্তকণ্ঠে নিজের পূর্বপুরুষদের রক্তস্পৃহা আর কাম-লালসার কথা বলে চলল ও, 'আমার ঠাকুর্দার বাবা খুন হননি, আসলে বোধহয় আত্মহত্যা করার জন্যই বেঁচেছিলেন। একরকম গাছের শেকড় দিয়ে চোলাই মদ বানাতেন তিনি। ঐ কুইন্টাল ছিল তাঁর সাগরেদ। দুজনে মিলে সারাক্ষণ মদ গিলে একেবারে চুর হয়ে থাকতেন। শেষকালে আমার ঠাকুর্দার বাবার বিকার দেখা দেয়, একদিন মত্ত অবস্থায় গলায় একটা পাথর বেঁধে লাফিয়ে পড়েন সমুদ্রে।

'এ'দিকে কুইন্টালের বৌ-ও, মানে সেই যার একটা কানটা ছিঁড়ে নিয়েছিল, সে-ও একদিন পাহাড় থেকে পড়ে মারা যায়। কুইন্টাল তখন ইয়ং-এর কাছে গিয়ে তার বৌকে দাবী করল। অ্যাডামসের কাছে গিয়েও হম্বিতম্বি জুড়ে দিল। কী? না তার বৌটাকেও চাই ওর। অ্যাডাম আর ইয়ং ভয় পেত কুইন্টালকে। ওরা জানত ফাঁক পেলেই কুইন্টাল ওদের খতম করে দেবে। তাই একদিন মওকা মতন ওরা দুজনে মিলে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে কুইন্টালকে মেরে দিল। তারপর একদিন ইয়ং মারা গেল। এই হচ্ছে ব্যাপার আর কি।'

ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট মন্তব্য করলেন, 'হুঁ, তার মানে খুন করার জন্যে তখন আর কেউ বেঁচে ছিল না।'

'আসলে ঈশ্বর ওদের পরিত্যাগ করেছিলেন'—জবাব দিল ম্যাকয়।

রাতের প্রাচীর ভেঙ্গে সূর্য চোখ মেললো। সকাল। পূবদিক থেকে অল্প অল্প বাতাস বইছে। ঐ ক্ষীণ বাতাসে দ্রুততালে দক্ষিণমুখো এগোনো অসম্ভব। জাহাজ বাঁ-দিকে ঘোরালেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট। সেই পশ্চিমমুখী স্রোতের আতঙ্কে ভুগছেন ক্যাপ্টেন, যা তাঁকে সরিয়ে এনেছে অনেকগুলো নিরাপদ আশ্রয়ের কোল থেকে। কেটে গেল সারা দিন, সারা রাত। বাতাসের দল নিরুদ্দেশ, পলাতক। নাবিকদের বরাতে জুটছে শুধু অল্প কিছু শুকনো কলা। অসন্তুষ্ট নাবিকরা গজরাচ্ছে। ওদের শরীরও দুর্বল হয়ে পড়ছে, একনাগাড়ে শুধু শুকনো কলা খেতে খেতে যন্ত্রণা হচ্ছে পেটে। সারাটাদিন স্রোতের টানে পাইরেনীস ভেসে চলেছে পশ্চিম-দিকে। দক্ষিণমুখী যাওয়ার মত হাওয়ার দেখা মেলেনি একবারও। রাতের প্রথম প্রহরের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণদিকে কিছু নারকেল গাছ দেখা গেল। জলের ওপরে জেগে আছে নারকেল গাছের মাথাগুলো। তার নিচে কোন এক নিচু প্রবালদ্বীপের ইশারা।

'ওটা হচ্ছে তেঙ্গা দ্বীপ', ম্যাকয় জানাল, 'বুঝলেন, আজ রাতে ঠিকমত বাতাস না বইলে আমরা আর ম্যাকেমোয় পৌঁছতে পারব না।'

'দক্ষিণ-পূর্ব বাতাসটা গেল কোথায়?' ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট অস্থির, 'হাওয়াটা বইছে না কেন? হলোটা কী?'

ব্যাখ্যা দিল ম্যাকয়, 'এদিকে অনেকগুলো বড় বড় লেগুন আছে। সেগুলো থেকে প্রচুর বাষ্প উঠছে। ঐ বাষ্পের দাপটেই বাতাসের গোটা ছকটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আবার ঐ জন্যেই মাঝে-মাঝে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। এই অঞ্চলটা খুবই বিপজ্জনক। সেইজন্যেই এখানটাকে ডেঞ্জারাস আর্কিপেল্যাগো বলা হয়, ক্যাপ্টেন।'

ম্যাকয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট। কোন একটা অভিসম্পাত যেন ছিটকে উঠল তাঁর গলার কাছে। কিন্তু পরক্ষণেই সংযত করে নিলেন নিজেকে। না, এ মানুষটার সামনে ও-সব কথা উচ্চারণ করা যায় না। জাহাজে

আসার পর থেকে ম্যাকয়ের প্রভাব বেড়েই চলেছে দিন দিন। দরিয়ার বুকে ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট বরাবরই একনায়ক, কাউকে ভয় পান না, জিভের কোন আগল নেই। কিন্তু এখন, এই বাদামী চোখ আর ঘুঘুপাখির মত স্বরবিশিষ্ট মানুষটির সামনে দাঁড়িয়ে, মুখে তাঁর কুলুপ। উচ্চারণ করতে পারছেন না কোন খারাপ কথা। ব্যাপারটা উপলব্ধি করা মাত্রই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন। এই মানুষটি ম্যাকয়ের, বাউন্টি জাহাজের সেই বিদ্রোহীর বংশধর, যে ম্যাকয় এখানে পালিয়ে এসেছিল ইংল্যাণ্ডের ফাঁসীর দড়ির নাগাল এড়িয়ে, যে ছিল পিটকেয়ার্ন দ্বীপের সেই প্রথম দিককার খুনোখুনি আর কামলালসার শরিক, ওহ্, এক অশুভ আত্মা।

ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট আদপেই ধর্মভীরু নন। কিন্তু সেই মুহূর্তে ম্যাকয়ের সামনে নতজানু হয়ে বসার এক অদম্য আবেগ ঠেলে উঠল তাঁর বুকের কাছে। নতজানু হয়ে কী বলবেন, তা তাঁর জানা নেই। কোন সুসম্বদ্ধ ভাবনা নয়, শুধু এক গভীর আবেগ। ঐ শিশুর মত সরল আর নারীর মত কোমল মানুষটির সামনে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র, বড় তুচ্ছ মনে হচ্ছে ক্যাপ্টেনের।

কিন্তু, তিনি যে ক্যাপ্টেন! অধস্তন অফিসার আর অন্য নাবিকদের সামনে নিজেকে অত ছোট করতে পারেন না তিনি। তাছাড়া, রাগটা এখনও পাক খাচ্ছে তাঁর শরীরে। হঠাৎ কেবিনের গায়ে ঘুষি মেরে চিৎকার করে উঠলেন ক্যাপ্টেন, 'শুনুন, আমি হার মানতে রাজি নই। এই পমোটাস আমাকে ঠকিয়েছে, বুদ্ধু বানিয়ে ছেড়েছে। কিন্তু আবার বলছি, মাথা আমি নোয়াব না। জাহাজ আমি চালিয়ে নিয়ে যাব। চালাতে চালাতে দরকার হলে একেবারে চীন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছব, তবু একটা আশ্রয় খুঁজে বার না করে থামব না। সবাই যদি চলে যায়, তো যাক। আমি যাব না, এ জাহাজ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। এই পমোটাসকে আমি দেখিয়ে ছাড়ব! কেউ আমাকে বেকুব বানাতে পারবে না। আমার পাইরেনীস বড় বাধ্য। যতক্ষণ এর একটা তক্তাও আস্ত থাকবে, ততক্ষণ আমি এ জাহাজ ছেড়ে নড়ব না। শুনতে পাচ্ছেন?'

'আমিও আপনার পাশে থাকব, ক্যাপ্টেন', ম্যাকয়ের ছোট্ট উত্তর।

সে রাত্তিরে দক্ষিণ দিক থেকে বইতে লাগল ক্ষীণ, এলোমেলো হাওয়া। অগ্নিকুণ্ডের সওয়ার ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্টের একজোড়া রাতজাগা ক্ষিপ্ত চোখের সামনে একটু একটু করে পাইরেনীস সরে গেল পশ্চিমদিকে। মাঝে মাঝে ম্যাকয়ের কান বাঁচিয়ে নিচু গলায় অভিসম্পাত উচ্চারণ করছিলেন অসহায় ক্যাপ্টেন।

দিনের আলোয় দক্ষিণদিকে আরও কিছু তালগাছ দেখা গেল।

ম্যাকয় বলল, 'হাওয়ার সাহায্য পেলে ওখানে যাওয়া যেত। ঐ হচ্ছে ম্যাকেমে দ্বীপ। তবে এখান থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে গেলে কাতিউ দ্বীপটা পাওয়া যাবে। ওদিকেই যাওয়া যাক বরং।'

কিন্তু স্রোত, দুটো দ্বীপের মধ্যে বয়ে-যাওয়া স্রোতের টান, পাইরেনীসকে সরিয়ে নিয়ে গেল উত্তর-পশ্চিম দিকে। দুপুর একটা নাগাদ দূরে দেখা গেল কাতিউদ্বীপের তাল গাছের সারি, পরক্ষণেই তা হারিয়ে গেল গভীর জলের আড়ালে।

মিনিটখানেক পরেই ক্যাপ্টেন টের পেলেন—উত্তর-পশ্চিম থেকে বয়ে আসা একটা নতুন স্রোতের মাঝে ঢুকে পড়েছে জাহাজটা। আর ঠিক তখনই মাস্তুল-শীর্ষের নজরদার জানান্ দিল—উত্তর-পশ্চিম দিকে আবার কিছু নারকেল গাছ দেখা যাচ্ছে।

'ওটা হচ্ছে রারাকা দ্বীপ', বলল ম্যাকয়, 'হাওয়ার ঠেল্ না পেলে আমাদের পক্ষে ওখানে যাওয়া সম্ভব হবে না। স্রোতের টান আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ-দিকে। তবে আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে। আর কয়েক মাইল এগোলে উত্তরমুখী একটা স্রোতের সামনে পড়তে হবে। স্রোতটা আবার পাক খেয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘুরে যায়। ঐ স্রোতের টানে পড়ে গেলে আমরা আর ফাকারাভায় পৌছতে পারব না। হ্যাঁ, এই ফাকারাভাই এখন পাইরেনীসের সবচেয়ে ভাল আশ্রয় হতে পারে।'

'এ-সব স্রোত-ট্রোত আমাদের যেখানে খুশি টেনে নিয়ে যাক', উষ্মা ঝরে পড়ল ক্যাপ্টেনের কথায়, 'এ জাহাজকে আমি কোথাও-না-কোথাও ঠিক ভেড়াবোই।'

কিন্তু পাইরেনীসের অবস্থা এখন চরম পরিণতির দিকেই এগোচ্ছে। ডেকটা তেতে আগুন। তাপ আর কিছুটা বাড়লেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠতে পারে ডেকে। অনেক জায়গায় মোটা সোলের জুতো পরেও রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না। পা বাঁচানোর জন্য খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হচ্ছে নাবিকদের। ধোঁয়াও উঠছে অনেক বেশি, চোখ মুখ জ্বলে যাওয়া কটু ধোঁয়া। জাহাজের প্রত্যেকের চোখ ফুলে ঢোল। দমবন্ধ হয়ে আসছে, কাশি থামছে না—যেন একদল যক্ষ্মারোগী ভেসে চলেছে সমুদ্রে। বিকাল নাগাদ বোটগুলো জলে নামানো হল। জিনিসপত্রও তুলে দেওয়া হল বোটে—শেষ সম্বল কিছু শুকনো কলা, অফিসারদের যন্ত্রপাতি এইসব। এমনকি ক্রোনোমিটারটা পর্যন্ত বড় বোটটায় তুলে দিলেন

ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট। যে-কোন মুহূর্তে উড়ে যেতে পারে ডেকটা, কাজেই সব কাজ আগেই শেষ করে রাখা দরকার।

সারাটা রাত কেটে গেল বুকে দুশ্চিন্তার পাথর নিয়ে। তারপর আলো ফুটল। সকালী আলোয় নাবিকরা একে অপরের দিকে তাকাল, শূন্য দৃষ্টি, মৃত্যুর-ছাপ পড়া মুখ, আশ্চর্য, এখনও টিকে আছে জাহাজটা? এখনও বেঁচে আছি আমরা?

দ্রুত পায়ে, কখনও বা গোড়ালি তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে ডেকের অবস্থা পরীক্ষা করছিলেন ক্যাপ্টেন। ফিরে এসে বললেন, 'আর কিছুক্ষণ, বড়জোর কয়েক ঘণ্টা। তারপর……'

মাস্তুলশীর্ষ থেকে ভেসে এল নজরদারের চিৎকার—ডাঙা, ডাঙা! ডেক থেকে কোন ডাঙার চিহ্ন চোখে পড়ছে না। মাস্তুলশীর্ষে উঠে গেল ম্যাকয়, আর সেই সুযোগে আশ মিটিয়ে প্রকৃতিকে কিছু অভিসম্পাত দিয়ে নিলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু হঠাৎই থামতে হল তাঁকে, কারণ উত্তর-পূর্ব দিকে সাগরের জলে দেখা যাচ্ছে একটা কালো রেখা! না, কোন আচমকা ঝড় নয়, স্বাভাবিক মাঝারি বাতাস। এই সেই এলোমেলো হয়ে যাওয়া আয়নবায়ু। অভিমুখ থেকে আট পয়েণ্ট সরে গেলেও, আবার ফিরে আসছে নিজের দায়িত্বটুকু পালন করতে।

পিছিলে নেমে এসে ম্যাকয় বলল, 'ফাকারাভার পূব দিকের ডাঙাটা দেখা যাচ্ছে ক্যাপ্টেন। আমাদের এখন পুরোদমে জাহাজ চালাতে হবে। হাওয়াটা পাওয়া গেছে, সবকটা পাল খাটিয়ে দিতে বলুন।'

এক ঘণ্টা পর ডেক থেকে কিছু নারকেল গাছ আর নিচু একটা ডাঙা চোখে পড়ল। প্রত্যেকের মনের মধ্যে অসহ্য তোলপাড—আর বুঝি বুঝতে পারবে না পাইরেনীস! তিনটে বোটই জলে নামিয়ে রেখেছেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট। যাতে বোটগুলোর মধ্যে ঠোকাঠুকি না লেগে যায়, তার জন্যে প্রতিটা বোটে রয়েছে একজন করে নাবিক। তীরের খুব কাছে চলে এসেছে পাইরেনীস, ফেনায় সাদা প্রবালদ্বীপটা আর বড়জোর সিকি মাইল দূরে।

'জাহাজ ঘোরাতে হবে, ক্যাপ্টেন। তৈরি হোন'—জানাল ম্যাকয়।

মিনিট খানেকের মধ্যেই সরে গেল ডাঙাটা, দেখা গেল একটা সঙ্কীর্ণ প্রবেশ পথ। তার ওদিকেই একটা লেগুন। যেন ছড়িয়ে রয়েছে মাইল তিরিশেক লম্বা আর মাইল দশেক চওড়া একটা বিশাল আয়না।

'ক্যাপ্টেন, এইবার।'

হুইল ঘুরল জাহাজের, শেষবারের মতো ঘুরে দাঁড়াল পাল খাটানোর আড়কাঠগুলো। প্রবেশপথের দিকে ছুটল পাইরেনীস। সবে মুখ ঘুরিয়েছে জাহাজটা, কোন সমস্যা হয়নি, এমন সময় হঠাৎই নাবিক আর মেটরা আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে ছুটে গেল পিছিলের দিকে। না, নতুন কিছু ঘটেনি, তবু এক অজানা আতঙ্কে বিবর্ণ ওরা—কিছু একটা ঘটবে, ঘটবেই, এই ঘটল বুঝি! কেন যে এই ভাবনা, তা ওরা জানে না! শুধু জানে কিছু একটা, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে চলেছে। আগিলের দিকে পা বাড়াল ম্যাকয়। হাল ধরতে হবে, জাহাজটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে লেগুনের মধ্যে। তখনই এগিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন, চেপে ধরলেন ম্যাকয়ের কাঁধটা, বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়েই কাজ করুন। ডেকে যাওয়াটা মোটেই নিরাপদ নয়।' পরমুহূর্তেই শোনা গেল তাঁর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর, 'কী ব্যাপার, জাহাজ যে নড়ছে না!'

হাসল ম্যাকয়, 'সাত নট্ স্রোত ঠেলে আমাদের এগোতে হচ্ছে, ক্যাপ্টেন! ভাটার ভরা স্রোতটা ঠেলে এইভাবেই তো যেতে হবে।'

আরও একটা ঘণ্টা কেটে গেল। প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পাইরেনীস। তবে এখন হাওয়ার জোর কিছুটা বেড়েছে, একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে জাহাজটা।

ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা কয়েকজন বরং বোটে উঠে যাও।'

সবে কথাটা শেষ করেছেন ক্যাপ্টেন, কয়েকজন নাবিক উঠতে যাচ্ছে বোটে, এমন সময় বিস্ফোরণটা ঘটল। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া আর আগুনের হাজার হল্কা ছড়িয়ে ডেকের মাঝখানটা সশব্দে ছিটকে উঠল ওপরে। কিছু টুকরো আটকে গেল পাল আর দড়িদড়ার সঙ্গে, বাকিটা আছড়ে পড়ল জলের বুকে! হাওয়াটা পাশ থেকে বইছে বলে বেঁচে গেছে পিছিলে জড়ো হওয়া মানুষগুলো। বোটে ওটার জন্য হুড়মুড়িয়ে ছুটল ওরা। আর তখনই শোনা গেল ম্যাকয়ের সেই আশ্চর্য প্রশান্তিভরা কণ্ঠস্বর, থমকে দাঁড়াল আতঙ্কিত মানুষগুলো। ম্যাকয় বলল, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সব ঠিকই আছে। কেউ একজন ঐ ছেলেটাকে একটু বোটে নামিয়ে দিন।'

হুইলে দাঁড়ানো নাবিকটি আতঙ্কে নিজের জায়গা ছেড়ে সরে গেছে। স্রোতের ধাক্কায় বেতাল হয়ে পড়বে জাহাজ, বিপদ ঘটে যাবে! লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট, শক্ত হাতে চেপে ধরলেন হুইলটা।

কনিগের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন, 'আপনি বরং বোটগুলোয়

দেখাশোনা করুন। পিছিলের নিচে একটা বোটকে বেঁধে দিন। দরকার হলে আমি লাফিয়ে নেমে যাব!'

একটু ইতস্তত করলেন কনিগ, তারপর চুপচাপ রেলিং-এর ধারে গিয়ে বোটে নেমে গেলেন।

'স্পিডটা আরও আধ পয়েন্ট বাড়িয়ে দিন, ক্যাপ্টেন।'

চমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট। তাঁর ধারণা ছিল জাহাজে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই।

'বাড়িয়ে দিয়েছি', নির্দেশ পালন করে উত্তর দিলেন ক্যাপ্টেন।

পাইরেনীসের ডেকের মাঝখানটা ততক্ষণে আগুনের খেলাঘর হয়ে উঠেছে গলগল করে ধোঁয়া উঠছে, মাস্তুল ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়ার প্লাবন, আর তার দাপটে জাহাজের সামনের দিকটা একেবারে দেখাই যাচ্ছে না। ম্যাকয় দাঁড়িয়ে আছে একেবারে পিছনের মাস্তুলটার নিচে, ধরে আছে হাল, সমস্যাসঙ্কুল প্রবাল পথ উজিয়ে জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কঠিন কাজে ব্যস্ত। বিস্ফোরণের জায়গা থেকে আগুনের থাবা এগিয়ে আসছে জাহাজের পিছন দিকে। ওদিকে আগুনের ফুলকি লেগে জ্বলে ছাই হয়ে গেল প্রধান মাস্তুলের ফুলে-ওঠা ক্যানভাসটা। সামনের দিকটা আর দেখা যাচ্ছে না, তবে বোঝা যাচ্ছে বড় পালগুলো টিকে আছে এখনও।

'লেগুনের ভেতরে ঢোকার আগে সবকটা পাল যদি পুড়ে না যায়, তাহলে...', কথাটা শেষ করতে পারেন না ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট।

'পুড়বে না', ম্যাকয়ের গলায় চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাস, 'হাতে এখনও প্রচুর সময় আছে ক্যাপ্টেন। জাহাজ ঠিক পৌঁছে যাবে। একবার লেগুনের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলে গতিটা আরও কিছুটা বাড়িয়ে দেব। তাহলে ধোঁয়াটা আর এদিকে আসবে না আগুনটাও পিছিলের দিকে এগোতে পারবে না।'

আগুনের একটা শিখা লাফিয়ে উঠল পিছনের মাস্তুলটার পাশে। এই বুঝি ছুঁয়ে ফেলে নিচের ক্যানভাসটাকে! না, অতটা উঠতে পারল না সেই অগ্নিশিখা। ওপর থেকে দড়িদড়ার একটা জ্বলন্ত পিণ্ড খসে পড়ল একেবারে ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্টের কাঁধের ওপর। মৌমাছির হুল-ফোটা মানুষের মত চকিত ঝটকায় পিণ্ডটা শরীর থেকে ঝেড়ে ফেললেন ক্যাপ্টেন।

'জাহাজটা ঠিক কোন্‌দিকে এগোচ্ছে, ক্যাপ্টেন?'

'উত্তরপশ্চিম-পশ্চিম দিকে।'

'ওটাকে পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম করে দিন।'

'হুইলে চাপ দিলেন ক্যাপ্টেন। মুখ ঘোরালেন জাহাজের।'

'এবার শুধু পশ্চিম-উত্তর।'

'করেছি।'

'আচ্ছা, এবার পুরো পশ্চিমে।'

ধীরে ধীরে, একটু একটু করে, লেগুনের মধ্যে প্রবেশ করল পাইরেনীস। প্রায় গোল হয়ে ঘুরল জাহাজটা, যাতে বাতাসকে পিছনে রেখে এগোনো যায়। আর, প্রতিটা পদক্ষেপে, প্রশান্ত নিশ্চয়তার সঙ্গে, যেন হাজার বছর সময় আছে হাতে এমনভাবে, জাহাজের গতিমুখ পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়ে চলেছে ম্যাকয়।

'আরেক পয়েন্ট ঘোরান, ক্যাপ্টেন।'

'ঘুরিয়েছি।'

হুইলটা বেশ কিছুটা ঘুরিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট, তারপর হঠাৎ ঘোরালেন উল্টোদিকে, ফের কিছুটা ডানদিকে।

'এবার সোজা করুন।'

'করেছি।'

হাওয়া এখন পাশ থেকে বইলেও উত্তাপটা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে। কম্পাসটার দিকে সরাসরি তাকাতে পারছেন না ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট, ত্যারছাভাবে তাকাতে হচ্ছে। একবার ডান হাতে হুইল ধরলেন, একবার বাঁ হাতে, কারণ ফোস্‌কা-পড়া মুখটা আড়াল করা কিম্বা আগুনের ফুলকি ঝারার জন্য সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকছে তাঁর একটা হাত। প্রচণ্ড উত্তাপে ম্যাকয়ের দাড়িটা পুড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে, বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তীব্র কটু গন্ধ বেরোচ্ছে পোড়ার। ক্যাপ্টেনও গন্ধটা পাচ্ছিলেন। উৎকণ্ঠিত চোখে ম্যাকয়ের দিকে তাকালেন তিনি। ক্যাপ্টেনের হাত অজস্র ফোসকায় ভরে গেছে। মাঝে মাঝে ট্রাউজারে হাত ঘষছেন তিনি। এমন সময় লক্‌লক্‌ করে লাফিয়ে উঠল হিংস্র অগ্নিশিখা, পিছন-মাস্তলের সবকটা পাল মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কোন রকমে মুখটুকু আড়াল করে আগুনের হল্‌কা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করল জাহাজের শেষ যোদ্ধা দুজন।

সামনেই দেখা যাচ্ছে নিচু তীরভূমি। সেদিকে চোখ রেখে ম্যাকয় বলল, 'এবার স্পিডটা চার পয়েন্ট বাড়িয়ে দিয়ে জাহাজটাকে ছুটতে দিন, ক্যাপ্টেন।'

দুজনের চারপাশে আর মাথার ওপর ঝরে ঝরে পড়ছে জ্বলন্ত দড়িদড়া, ক্যানভাসের টুকরো। আলকাতরা মাখানো দড়ির একটা বাণ্ডিল খসে পড়ল ক্যাপ্টেনের পায়ের

কাছে, গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে বাণ্ডিলটা থেকে। প্রচণ্ড একটা কাশির দমকে নুয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন, কিন্তু হুইল-ধরা হাতের মুঠিটা শিথিল হল না এতটুকু।

নরম প্রবালের আস্তরণে যেয়ে আঘাত করল পাইরেনীস, সামনের দিকটা উঁচু হয়ে উঠল, তারপর থেমে গেল জাহাজ। আঘাতের ধাক্কায় চারদিক থেকে বৃষ্টির মত ঝরে পড়ল রাশ রাশ আগুন। পেছিয়ে এসে আবার এগোল জাহাজটা, আবার আঘাত করল প্রবালের শরীরে। ভেঙে গেল প্রবালের পল্‌কা আস্তরণ। তারপর আবার এগিয়ে গিয়ে তৃতীয়বার আঘাত হানল পাইরেনীস।

'অবশেষে মুক্তি।' বলল ম্যাকয়। তারপরই শান্তকণ্ঠে শুধোল, 'সত্যিই মুক্তি?'

'কী জানি', ক্যাপ্টেনের উত্তর।

'যাকগে। দেখুন, জাহাজটা পাক খাচ্ছে।' বলতে বলতে পাশের দিকে চোখ রাখল ম্যাকয়. 'নরম, সাদা বালি। এর থেকে ভাল আর কী আশা করা যায়! সুন্দর আশ্রয়।'

বাতাসের উল্টোদিকে ঘুরে গেল পাইরেনীসের পিছন দিকটা। আর ঠিক তখনই একরাশ ধোঁয়া আর আগুন হু হু করে ছড়িয়ে পড়ল পিছন দিকে। অসহ্য যন্ত্রণায় ড্যাভেনপোর্টের হাতটা ছিটকে সরে এল হুইল থেকে। বোট বাঁধার কাছিটার দিকে সরে গেলেন তিনি। কিন্তু, ম্যাকয়? চকিতে পিছু ফিরলেন ক্যাপ্টেন। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ম্যাকয়, বোটে নামার জন্য রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে ক্যাপ্টেনকে.

'আগে আপনি'. চিৎকার করে উঠলেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট, ম্যাকয়ের কাঁধ দুটো ধরে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিলেন রেলিং-এর ওপারে। আগুন আর ধোঁয়া তখন সর্বগ্রাসী চেহারা নিয়েছে। ম্যাকয়ের পিছু পিছু লাফ দিলেন ক্যাপ্টেন। কাছির ওপর দিয়ে হড়কে বোটে গিয়ে ছিটকে পড়লেন দুজনে। কোনরকম নির্দেশের অপেক্ষা না করে মুহূর্তের মধ্যে ছুরি দিয়ে কাছিটা কেটে দিল একজন নাবিক। বিদ্যুৎবেগে জলের বুকে ঝড় তুলল কতকগুলো দাঁড়, তরতর করে এগিয়ে গেল বোটটা।

পিছন দিকে তাকিয়ে আন্‌মনা গলায় বলল, 'জাহাজটার চমৎকার আশ্রয় জুটেছে, ক্যাপ্টেন।'

'সত্যিই চমৎকার, আর তার সমস্ত কৃতিত্বটুকু আপনারই', উত্তর দিলেন ক্যাপ্টেন ড্যাভেনপোর্ট।

ভাঙাচোরা প্রবালভরা লেগুনের সাদাবালির বেলাভূমির দিকে এগিয়ে চলল তিনটে

বোট। বেলাভূমি পেরিয়ে চোখে পড়ছে সারি সারি নারকেল গাছ, তার নিচে খান ছয়েক ঘাসে-ছাওয়া কুটির, আর তার সামনে কুড়ি-পঁচিশজন উত্তেজিত দ্বীপবাসী। জ্বলন্ত জাহাজটার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে মানুষগুলো।
বোট তিনটে স্পর্শ করল তীর। দীর্ঘ পরিক্রমা শেষে শুভ্র বেলাভূমির বুকে পা রাখল ক্লান্ত ক্লিষ্ট আগুন ঝলসানো নাবিকের দল।
আর তখনই ম্যাকয় বলে উঠল, 'এবার আমাকে পিটকেয়ার্নে ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে।'

— — —